গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ১০ - ১৬ জুন, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

এক বছরেই প্রমাণিত ইউ পি এ সরকার কাদের স্বার্থে চলছে

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ও সিপিএম সমর্থিত ইউ পি এ সরকারের এক বছর পূর্ণ হল। ঘটা করে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানও হল দিল্লিতে। খুশি খুশি মুখে কংগ্রেসের তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা ফিরিস্তি দিলেন এক বছরের কাজের সাফল্যের। সিপিএম অবশ্য সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল না। তবে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে সিপিএম নেতাদের বেশ কিছুটা নাটক করতে হল। কারণ, তাদের 'ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল' সরকারটির এক বছরের শাসনেই দেশের শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের যে হাল হয়েছে, তাতে জনগণের বিক্ষোভ যে বেড়েছে, একথা সিপিএম নেতারা ভালভাবেই বুঝেছেন। তাই পশ্চিমবাংলা ও কেরালার আগামী বিধানসভা নির্বাচনের হিসাব মাথায় রেখে, জনগণের সামনে বিরোধী ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য সিপিএমকে অধুনা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কিছু ইস্যু তুলে খানিকটা গরম বিরোধিতার ভান করতে হচ্ছে। এজন্য সরকারের বিরুদ্ধে কখনও **দু'চার**টে গরম শব্দ ব্যবহার করেই আবার তাদের ছুটতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী, না হয় সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে প্রাতরাশে এবং বুঝিয়ে আসতে হচ্ছে যে, তারা সত্যি সত্যিই সরকারের বিরোধিতা করছে না, বরং সরকারের পাশেই আছে। এখন বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ না দিলে ভোটের স্বার্থে বিরুদ্ধতার ভান বজায় রাখা যাবে ঠিকই, কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি মনে করে মালিকশ্রেণী ও কংগ্রেস যদি ভুল বোঝে? এই ধন্দে পড়েই কৌশল ঠিক করতে সিপিএমকে এমনকী পলিটব্যুরোর বৈঠকে বসতে হয়েছে। অবশেষে নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে ভান বজায় রাখার কৌশলগত লাইনের পক্ষে পাল্লা ভারি হওয়ায়, সিপিএম নেতারা বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও কংগ্রেসকে পাঁচ বছরের জন্য নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে যাওয়ার গ্যারান্টির কথা পুনরায় উল্লেখ করতে ভুল করেননি।

বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সরকারের বিগত এক বছরের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজে তাঁর সরকারকে দশের ভিতর ছয় দিয়েছেন। সাড়ে ছয় দিয়েছে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সংস্থা 'অ্যাসোচেম'। এই মূল্যায়নের মাপকাঠি কী তার উল্লেখ প্রধানমন্ত্রী না করলেও অ্যাসোচেম দেশের ১২টি ক্ষেত্রে 'উন্নয়ন' তথা সংস্কারের হারকে মাপকাঠি হিসাবে স্থির করেছিল। এই উপলক্ষে তারা দেশের বিভিন্ন নাম করা কর্পোরেট সংস্থার ২৫০ জন শীর্ষস্থানীয় ম্যানেজারের মতামত নিয়েছে। তার ভিত্তিতেই অ্যাসোচেমের এই মূল্যায়ন। যে ১২টি ক্ষেত্রে সরকারের সংস্কারের কাজে খুশি হয়ে মালিক মহলের এই সার্টিফিকেট, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ কৃষি উন্নয়নে জোর, শিল্পে কর্মকুশলতা, শ্রম সংস্কার, পরিকাঠামো উন্নয়ন, আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কার, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, সুদের হার নিয়ে অবস্থান, বিলগ্নিকরণ, মূলধনী বাজারের আরও উদারিকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্যে জোর প্রভৃতি। এর মধ্যে বিলগ্নিকরণ এবং শ্রম আইনে সংস্কারের ক্ষেত্রে মালিকরা যত দ্রুত সংস্কার চেয়েছিল ততখানি অগ্রগতি নাকি হয়নি। তবে সরকার যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে মালিকদের এ আফসোস বোধহয় আর বেশিদিন থাকবে না!

ধনী ও গরিবে বিভক্ত আমাদের এই দেশে কংগ্রেস বরাবরই ধনী মালিকশ্রেণীর দল। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস এদেশে একটানা রাজত্ব চালিয়েছে ; জনগণের সমস্ত স্বপ্ন, আকাঙ্খাকে চুরমার করে দিয়ে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে দেশে পুঁজিবাদকেই সংহত করেছে। তাদের দীর্ঘ শাসনে সাধারণ মানুষ ক্রমাগত দারিদ্রের নিম্নসীমায় নেমে গেছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণী পুঁজির পাহাড় জমিয়েছে। ভারতবর্ষে যে মুষ্টিমেয় একচেটে পুঁজিপতিরা আজ পুঁজির জোরে বিদেশের বাজার ধরতে ছুটছে, তারা কংগ্রেসের 'গরিবি হটাও' শাসনকালেই নির্লজ্জ পুঁজির ভাণ্ডার

ছয়ের পাতায় দেখুন

গরিব মধ্যবিত্তদের উপর

কলকাতায় জলকর বসছে

কলকাতা কর্পোরেশনে বামফ্রন্ট জিতলে যে জলকর বসাবে একথা খোলাখুলি স্বীকার করলেন বামফ্রন্টের মেয়র হিসাবে তুলে ধরা প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। ২ জুন মধ্য কলকাতার রোটারি সদনে আনন্দবাজার পত্রিকা আয়োজিত 'আপনার মুখোমুখি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, 'নিঃশুল্ক জল সব শহরবাসীর পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। আয়করের মত জলকরের বিন্যাসও করা যেতে পারে। তবে আমি সকলের জন্য জলকরের বিরোধী। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩-৬-০৫) নাগরিকদের ঘাড়ে জলকরের বোঝা চাপানোর এহেন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি মঞ্চে উপস্থিত একদা তৃণমূল অধুনা উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চের নেতা সুব্রত মুখার্জী। কারণ তিনিও মেয়র হিসাবে জলকর বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নানা চাপের মুখে পড়ে তিনি সেবারের মত পিছিয়ে এসেছিলেন। সিপিএম প্রার্থীর জলকর বসানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি মঞ্চে উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা, মেয়র প্রার্থী অজিত পাঁজা। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, করের বোঝা চাপানোর প্রশ্নে এই তিন দলের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য

আটের পাতায় দেখুন

হাসপাতালে ব্যাপক চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদে

লড়াইয়ের ডাক দিল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি

৩১ মে মেডিক্যাল কলেজ অডিটোরিয়ামে বেলা ১০টায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পশ্চিমবঙ্গ ২য় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে ৯০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেন। ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও কয়েকজন ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সংগঠনের প্রয়াত সভাপতি ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা। প্রস্তাবে বলা হয়, রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা সর্বজনবিদিত। বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি পুরোপুরি ব্যবসায়িক স্বার্থে চলে ; গরিব ও স্বল্প আয়ের মানুষের সেখানে চিকিৎসার সাধ্য নেই। সরকারি হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির ফলে তা এখন সাধারণ আয়ের রোগীদের নাগালের বাইরে। গ্রামীণ হাসপাতালগুলির অবস্থা খুবই খারাপ — ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, চুরি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ব্যাপক, রোগীদের প্রতি ন্যূনতম মানবিক দায়িত্বের অভাব। হাসপাতালগুলিতে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। রাজ্য সরকার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের নামে রাজ্যের ৯২১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৬০টি ব্লক ও ১০০টি রুরাল হাসপাতাল সহ ১২০০০ গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ৩০ বছরের লিজে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতার ও জেলার বড় হাসপাতালগুলিতে বেসরকারি হাতে সিটি স্ক্যান, এম আর আই মেসিন তুলে দিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে ১০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ এবং চুক্তির ভিত্তিতে নয় স্থায়ীভাবে শূন্যপদে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মী নিয়োগ, মেডিক্যাল শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি ও ক্যাপিটেশন ফি বন্ধ করা প্রভৃতি ১১ দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

সম্মেলনে ১৫০ জন সদস্য নিয়ে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে ডাঃ অসীমকুমার রায়চৌধুরী ও ডাঃ অশোক সামন্ত। সংগঠনের উপদেষ্টা ডাঃ সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রশান্তকুমার সরকারের

সাতের পাতায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

- বিহার বিধানসভা খারিজ
- ৯০ শতাংশ স্কুলছুট
- সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজের সংগ্রাম
- সিপিএম-সিপিআই নেতাদের পাকিস্তান সফর
- আন্দোলন সংবাদ

দার্জিলিং

পুরমন্ত্রীর পুরসভাতে বেহাল নাগরিক পরিষেবা

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি শহরের স্থানীয় কিছু সমস্যা সমাধানের দাবিতে গত ১৯ মে এস ইউ সি আই শিলিগুড়ি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে গণঅবস্থানের কর্মসূচি পালন করা হয়।

গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিলিগুড়ি শহরের কলেবর বাড়ছে। শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রেললাইনকে ঘিরে যানজট সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা না করেই। পার্শ্বস্থ যে রাস্তাগুলির উপর বেশি চাপ পড়বে সেগুলির সংস্কারও হয়নি। ফলে তীব্র যানজটের কবলে পড়ে প্রতিদিন মানুষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে। শহরের উন্নয়নের নামে বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই হকারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা হিমুল, কাঞ্চন ও এন বি এস টি সি'কে বেসরকারীকরণের চক্রান্ত চলছে। বর্ধিত পুরকর নাগরিকদের কাছ থেকে আদায় করা হলেও পরিষেবার উন্নয়ন নেই। দিনের পর দিন মশার প্রকোপ বেড়ে চলেছে। অধিকাংশ ড্রেন অত্যন্ত অপরিষ্কার। শহরের জনবহুল এলাকা বাজার ও বাসস্ট্যান্ডগুলিতে পানীয় জলের সুব্যবস্থা ও প্রস্রাবাগার নেই। এইসব সমস্যা সমাধানের দাবিতে এদিন স্থানীয় কোর্ট মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।

এই অবস্থানে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, কমরেড তন্ময় দত্ত প্রমুখ। কমরেড তন্ময় দত্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

১৮ মে নয়া পঞ্চায়েত কর, জমির খাজনা বৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, রেশন কার্ড ও বিপিএল কার্ডের দাবিতে মেদিনীপুর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ অবস্থান ও ডেপুটেশন। নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ প্রাণতোষ মাইতি, প্রভঞ্জন জানা, সুশান্ত সাহু প্রমুখ।

পূর্ব মেদিনীপুর

আন্দোলনের চাপে পাঁশকুড়া পুরসভার বর্ধিত খাজনা প্রত্যাহার

পাঁশকুড়া পুরসভা কর্তৃক জমির খাজনা বৃদ্ধি করা, পুর পরিষেবা না দিয়ে অত্যধিক পুরকর আদায় করার প্রতিবাদে এবং ওয়ার্ডগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা নির্মাণ ও পুর এলাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপনের দাবি সহ ১৩ দফা দাবিতে পাঁশকুড়া পুর নাগরিক কমিটি ১৮ মাস ধরে ধারাবাহিক আন্দোলন করে চলেছে। গত ১৭ মে উল্লিখিত দাবিগুলি নিয়ে ১৭টি ওয়ার্ডের সর্বস্তরের নাগরিকরা পুরসভায় বিক্ষোভ মিছিল করেন ও পুরপ্রধান ডাঃ ওমর আলিকে এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেন।

পুরপ্রধান বর্ধিত খাজনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং অন্যান্য দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন প্রতিনিধিদের।

পুরনাগরিক সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুনীল জানা বলেন — দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে বর্ধিত খাজনা কমেছে, ডেসিমেলে ১২ টাকার বদলে ৩৩ পয়সা হয়েছে। এটি আন্দোলনের একটি বড় জয়। বাকি দাবিগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। হলদিয়া-তমলুক উন্নয়ন পর্ষদে পাঁশকুড়া পুরসভাকে যুক্ত করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রী জানা বলেন, এর ফলে জমির খাজনা তিন-চারগুণ বাড়বে, সেচ এলাকায় ৪ একর ও অসেচ এলাকায় ৬ একর জমির যে খাজনা মকুব আছে তা উঠে যাবে। জমির মিউটেশন, চরিত্র পরিবর্তন, বাড়ির প্ল্যান সবই এই উন্নয়ন পর্ষদ থেকে অনুমোদন করাতে হবে। ফলে নাগরিকদের উপর করের বোঝা যেমন বাড়বে, হয়রানিও বাড়বে। সেজন্যই আমরা পর্ষদে তমলুককে যুক্ত করার বিরোধী। এই বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সুব্রত মাইতি, আব্দুল মাসুদ, উৎপল প্রধান, প্রণয় কুমার দাস ও অশোক ঘোষ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সুন্দরবন জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ডেপুটেশন

'সুন্দরবন বাঁচাও'-এর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে সরকার একদিকে বনবিবি উৎসব করছে, অপরদিকে ভুবনেশ্বরী অঞ্চলে ঠাকুরান ও মাকড়ি নদীর সংযোগকারী হুকাহারানিয়া নদীকে বেঁধে দিয়ে জলাধার সৃষ্টির নামে সুন্দরবনের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করতে চলেছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে এইভাবে নদীর স্বাভাবিক গতি বন্ধ করলে বড় নদীগুলি দ্রুত মজে যাবে ও জোয়ারের সময় জলের চাপ গ্রহণ করতে না পারার ফলে এলাকায় ভাঙনের গতি বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে, বর্ষায় দ্বীপভূমি জলমগ্ন হয়ে চাষের ও ধনসম্পত্তির সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এই সরকারি কর্মসূচির প্রতিবাদে এবং জলাধার তৈরি করার জন্য মজা খাল অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে ২৩ মে সুন্দরবন জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষা কমিটির উদ্যোগে জয়নগর ২নং বি ডি ও অফিসের সামনে দুই সহস্রাধিক মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সুকুমার হালদার। জয়নগর ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি গোবিন্দ হালদারের নেতৃত্বে আটজনের প্রতিনিধিদল বিডিও'র সাথে দেখা করেন। বিডিও এই কমিটির দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সেগুলি জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুরূপ ভাবে কুলতলি বিডিও অফিসে কুলতলির বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইতের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেন। এখানেও বিডিও দাবিগুলির সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন।

শহীদ বৈকুণ্ঠ শুকুল স্মরণে সভা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহীদ বৈকুণ্ঠ শুকুল স্মরণ দিবস গত ১৪ মে বিহারের মুজফফরপুর জেলার বি বি কলেজিয়েট স্কুল হলে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে এক সভার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। ব্রিটিশ পুলিশ কর্তা স্যান্ডার্স হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী ও পুলিশের গুপ্তচর ফণি ঘোষকে ১৯৩২ সালের ৯ নভেম্বর বেতিয়ায় তার সুরক্ষাগৃহে হত্যা করেন বৈকুণ্ঠ শুকুল ও চন্দ্রমা সিং। ১৯৩৩ সালের ৬ জুলাই পুলিশ তাঁকে সোনপুর ব্রিজ থেকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৩৪ সালের ১৪ মে গয়া জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর সাথে একই জেলে সেসময় ছিলেন বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগোবার সময় বৈকুণ্ঠ বলে যান ''দাদা, বিদায়। তবে আবার আমি আসব, কারণ দেশ তো এখনও স্বাধীন হয়নি।''

এই বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছবিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়েই এদিন সভা শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা, বর্তমানে এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং, সাহিত্যিক শশীকান্ত ঝা ও সেভ এডুকেশন কমিটির জেলা সম্পাদক বি প্রশান্ত, ডি এস ও'র মুজফফরপুর জেলা সম্পাদক কমরেড রাজকুমার চৌধুরী, জেলা প্রেসিডেন্ট কমরেড সঞ্জয় যাদব এবং প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শুভ নারায়ণ শর্মা।

দক্ষিণ দিনাজপুর

মহিলাদের উদ্যোগে ২৫টি মদের ভাটি উচ্ছেদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভাটপাড়া অঞ্চলের শিবরামপুর ও গাজীপুর গ্রামে দীর্ঘদিন চোলাই মদের ভাটি ও বেআইনি ব্যবসা চলছিল। এলাকার পরিবেশ ভীষণভাবে নষ্ট হচ্ছিল। যুবকরা সচেষ্ট হয়েও এই মদের ব্যবসা বন্ধ করতে পারেনি। মদ্যপ পুরুষদের উৎপীড়ন ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ মহিলারা, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গঠন করেন 'মদের ভাটি উচ্ছেদকারী মহিলা কমিটি।' এই কমিটির নেতৃত্বে মহিলারা মদের ভাটি উচ্ছেদের দাবিতে মিটিং, মিছিল, ডেপুটেশন, বিক্ষোভ করা সত্ত্বেও প্রশাসন নির্বিকার থাকে। অবশেষে ২৬ মে গাজীপুর মদের ভাটি উচ্ছেদকারী মহিলা কমিটির নেতৃত্বে এলাকার তিন শতাধিক মহিলা এলাকায় প্রচার ও মিছিল করে মদের ভাটি উচ্ছেদ অভিযানে নামেন এবং মদ তৈরির সরঞ্জাম ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। মহিলাদের তেজোদীপ্ত রুদ্র মূর্তি দেখে মদের কারবারিরা ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এলাকার যুবকরা এই কাজে মহিলাদের সহযোগিতা করেন। মহিলাদের এই সচেতন বলিষ্ঠ ভূমিকা এক বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে। সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড বাবলী বসাক মদের ভাটি উচ্ছেদকারী মহিলাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন — দিনের পর দিন অত্যাচারিত মহিলারা, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছেন তা বিভিন্ন এলাকার অত্যাচারিত মহিলাদের সংগঠিত হয়ে সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি করবে ও পথ দেখাবে। এই উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন এম এস এস-এর পক্ষ থেকে কমরেডস্ কৃষ্ণা মহন্ত, বাবলী বসাক, স্বপ্না মোদক, নমিতা মহন্ত, মধুমিতা মহন্ত এবং মদের ভাটি উচ্ছেদকারী মহিলা কমিটির সভানেত্রী আরতি বর্মন ও সম্পাদিকা দুর্গা বর্মন।

মদ তৈরির সরঞ্জাম গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন প্রতিবাদী মহিলারা

বিহার বিধানসভা খারিজ

সংসদীয় দলগুলির নীতিহীন ক্ষমতালিপ্সার ঘৃণ্য নজির

ক্ষমতার দাবিদার রাজনৈতিক দলগুলির সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ, নগ্ন দলবাজি, নির্লজ্জ ক্ষমতালোভ, ব্যক্তিস্বার্থ পূরণে বিধায়কদের বেআব্রু আচরণ — অর্থনৈতিক দিক থেকে চূড়ান্তভাবে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির অন্যতম বিহারের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণের ওপর আরও একটা ব্যয়বহুল নির্বাচনের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এই নির্বাচন কি অনিবার্য ছিল? নির্বাচনের ফলাফলে বিভিন্ন দল যেরকম আসন পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যদি কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ জোটের শরিকরা বিহারে ঐক্যবদ্ধ হতে পারতো তাহলে গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পরই সরকার গঠন করা যেতো। কিন্তু নিজ নিজ দলের এবং অবস্থাবিশেষে ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায়, তারা মিলিতভাবে সরকার গঠন করতে পারেনি। ফলে বিরোধীপক্ষ, অর্থাৎ বিজেপি, বিধায়ক কিনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের নোংরা খেলায় নেমে পড়ে এবং তারা প্রায় সফল হতে যাচ্ছে বোঝামাত্র কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার সিপিএমের সমর্থন নিয়ে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে বিহার বিধানসভা ভেঙে দেয়, যার ফলে নতুন একটা নির্বাচন ছাড়া এখন আর পথ নেই।

এইভাবে বিহারের জনগণের ঘাড়ে অবাঞ্ছিত একটা নির্বাচনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে বিহার ভেঙে দু-টুকরো করা হয়েছে। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ বিহার এখন নতুন রাজ্য ঝাড়খন্ড। রাজ্য ভাগের ফলে মন্ত্রী-আমলার সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু জনগণের অবস্থার উন্নতি হয়নি। আমাদের দেশের সকল রাজ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গরিব। তার মধ্যেও আবার বিহারের অবস্থা খুবই শোচনীয়। গোটা দেশের হিসাবে মাথাপিছু গড় আয় যেখানে ১২০০০ টাকা, বিহারে তা ৩৭০০ টাকা, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশেরও কম। সর্বভারতীয় হিসাবে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ২৬ শতাংশ, অথচ বিহারে সংখ্যাটা ৪২ শতাংশ। এই রাজ্যের ৩৪ শতাংশ মানুষের রোজগারের নির্দিষ্ট কোন উপায় নেই। মাত্র ২০ শতাংশ মানুষের পাকা বাড়ি আছে, ৪৫ শতাংশ মানুষের পানীয় জল জোটে না। স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে পারে মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ। বিহারের মাটির নিচের বহুমূল্য সম্পদ থেকে লাভবান হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী, খনিমালিক ও মাফিয়ারা। বিহারবাসী অগণিত মানুষকে রোজগারের জন্য গতর খাটতে যেতে হয় অন্য রাজ্যে। এহেন দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের ওপর শুধুমাত্র হীন দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থ ৫০০ কোটি টাকার নতুন একটা নির্বাচনের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

বিহার নির্বাচনের ফলাফলের তালিকায় চোখ রাখলেই দেখা যাবে ইউ পি এ-র শরিক দলগুলি, যারা কেন্দ্রে গদির স্বার্থে এক হয়েছে, তারা যদি বিহারে এক থাকতো তাহলে আর একটা ব্যয়বহুল নির্বাচনের বোঝা চাপত না। নির্বাচনের পর বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ছিল এই রকম —

বিজেপি ও জনতা দল (ইউনাইটেড)	—	৯৩
রাষ্ট্রীয় জনতা দল	—	৭৫
লোকজনশক্তি দল	—	২৯
কংগ্রেস	—	১০
সিপিএম, সিপিআই ও অন্যান্য	—	৩৬

উপরের তালিকা থেকে পরিষ্কার — সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে আটকাবার নাম করে কেন্দ্রে যারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ জোট করেছে সেই রাষ্ট্রীয় জনতা দল, লোকজনশক্তি, কংগ্রেস ও সিপিএম-সিপিআই মিলতে পারলে সরকার গঠন করা সমস্যা ছিল না। ক্ষমতা থেকে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপিকে দূরে রাখার ঘোষিত উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের যদি বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা থাকতো, তবে সেই কর্তব্যকে তারা নিজ নিজ সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতো। কিন্তু তা তারা দেয়নি। ইউ পি এ-র শরিক দলগুলি বিহারে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল যে, দিল্লিতেও তারা যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তার পিছনেও ক্ষমতার স্বার্থই মূল। নীতি-আদর্শের কথা বলাটা লোকঠকানো ছাড়া অন্য কিছুই নয়। দ্বিদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক বিজেপি জোটের বিপরীতে জনগণের সামনে নিজেদের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরার জন্য একটা ধর্মনিরপেক্ষতার সাইনবোর্ড লাগানো তাদের দরকার ছিল। কারণ, আর্থিক নীতি, বিদেশনীতি, প্রশাসন পরিচালনার নীতি কোন ক্ষেত্রেই বিজেপি'র এন ডি এ জোটের সাথে সিপিএম সিপিআই সমর্থিত কংগ্রেসের ইউ পি এ জোটের কোন পার্থক্য নেই। ফলে সেই পার্থক্য দেখাতেই ধর্মনিরপেক্ষতার সাইনবোর্ড। নাহলে যে কংগ্রেসকে আজ ধর্মনিরপেক্ষ বলে সিপিএম, সিপিআই সার্টিফিকেট দিচ্ছে, সেই কংগ্রেস শাসনে আলিগড়, মীরাট, রাউরকেলা, ভাগলপুর সহ দেশের নানা জায়গায় অসংখ্য দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে; আসামে, নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলতে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ প্রত্যাহার করে নেলি-গণহত্যার রাস্তা কংগ্রেসই খুলে দিয়েছিল; বিতর্কিত বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন স্বয়ং রাজীব গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর কংগ্রেস প্রত্যক্ষভাবে দিল্লিতে শিখবিরোধী দাঙ্গা ঘটিয়েছিল। সেই কংগ্রেসের গায়েই ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্বার্থে দ্বিদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় বিজেপি-র বিকল্প সাজাতে ধর্মনিরপেক্ষতার লেবেল এঁটে দিয়েছে তথাকথিত বামপন্থীরাই। তাদের এই ধর্মনিরপেক্ষতা যে বাস্তবে মুখোশ ছাড়া কিছুই নয়, যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতা দখল করে আপনাপন স্বার্থ চরিতার্থ করাই যে এর মূল লক্ষ্য, বিহারের সাম্প্রতিক নির্বাচনে তা একেবারে নগ্ন হয়ে গিয়েছে।

সংসদীয় দলগুলির ঘৃণ্য ক্ষমতা লালসা

গত ফেব্রুয়ারিতে ভোটের পর ইউ পি এ-র শরিক দলগুলি মিলতে না পারায় বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হয়ে যায়। প্রথম থেকেই বিহার নির্বাচনে ইউ পি এ-র শরিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। কেন্দ্রে আরজেডি'র লালুপ্রসাদ যাদবের সাথে মিলে সরকার পরিচালনা করলেও লালুপ্রসাদের দীর্ঘ অপশাসনে অতিষ্ঠ জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য কংগ্রেস বিহারে গত বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি-বিরোধী অবস্থান নেয়। অথচ এর আগের বিধানসভা নির্বাচনে, এমনকী লোকসভা নির্বাচনেও কংগ্রেস আরজেডি'র সাথে ঐক্য করেই নির্বাচন লড়েছিল। অন্যদিকে লালুপ্রসাদের আরজেডি'র বিরুদ্ধে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের আর এক শরিক রামবিলাস পাশোয়ানের লোকজনশক্তি পার্টি নিজস্ব দলিত ভোটব্যাঙ্কের সাথে বিশেষত উচ্চবর্ণের কুখ্যাত বাহুবলীদের স্বপক্ষে টেনে এনে উচ্চবর্ণের ভোট কব্জা করে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নামে। কংগ্রেস রামবিলাসের লোকজনশক্তি পার্টির সাথে আসন সমঝোতা করে। ফলে চন্দ্রভান, মুন্না শুক্লার মতো কুখ্যাত বাহুবলীদের সাহায্য নিয়ে লোকজনশক্তি ২৯টি আসনে জেতে এবং সরকার গঠনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

সিপিএম, সিপিআই বিহারে এর আগের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনেও আর জে ডি ও কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করেই নির্বাচনে লড়েছে। নির্বাচনের পর তারা লালুপ্রসাদের দুর্নীতি ও জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই সহ অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে মিলে মোর্চা গড়ে তুলে আন্দোলনে নামে। কিন্তু নির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথে আন্দোলন ছেড়ে দিয়ে তারা লালুপ্রসাদের সাথে ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সিপিএম আরজেডি'র সাথে মিলেই নির্বাচনে লড়ে। সি পি আই পাশের রাজ্য ঝাড়খন্ডে লালুপ্রসাদের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও বিহারে আসন ভাগাভাগিতে বনিবনা না হওয়ায়, লালুপ্রসাদের সঙ্গে সমঝোতা করে কিছু আসনে প্রার্থী দেয় আবার তার বাইরেও প্রার্থী দেয়। বলাবাহুল্য কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াই কেবলমাত্র গদির স্বার্থে আসন সমঝোতা হওয়ায় এগুলি রাজনৈতিক জোটের চরিত্র নেয়নি এবং বিজেপিকে পুরোপুরি কোণঠাসা করতেও পারেনি। বিজেপি-নীতীশ কুমারের জেডিইউ জোট ৯১টি আসন পায়।

ভোট পরবর্তী নোংরা খেলা

ভোটের পর ক্ষমতার লোভে শুরু হয় নতুন খেলা। ক্ষমতা হাতে পাওয়ার লোভে কংগ্রেস পাশোয়ানের উপর চাপ দিতে থাকে। সেই চাপে রামবিলাস পাশোয়ান বলেন — নীতীশকুমার যদি এনডিএ ছেড়ে আসেন তবে কংগ্রেস-লোকজনশক্তি জে ডি ইউ-কে নিয়ে সরকার গড়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এন ডি এ জোট বুঝে ফেলে যে ইউ পি এ-র শরিকরা বিহারে লালুপ্রসাদের সঙ্গে জোট বাঁধবে না। কাজেই তারাও সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকে। সুযোগ আসতেও দেরি হয়নি।

সরকার গঠনের টালবাহানা, কালক্ষেপ এবং শেষপর্যন্ত ক্ষমতা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় লোকজনশক্তি পার্টির বিধায়করা অস্থির হয়ে পড়ে। যেহেতু কোন নীতির জন্য নয়, নিছক স্বার্থের জন্যই এরা রাজনীতিতে এসেছে — তাই মন্ত্রী হওয়া বা সরকারি ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আখের গোছানোই এসব রাজনীতি-ব্যবসায়ী বিধায়কদের লক্ষ্য। এজন্যই এদেশে বিধায়ক বেচাকেনা প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস-বিজেপি কেউই এ থেকে মুক্ত নয়। এই অবস্থায় বিজেপি লোকজনশক্তি পার্টির বিধায়কদের কিনে নিচ্ছে ও তাঁর দল ভাঙছে বুঝে মরিয়া রামবিলাস পাশোয়ান শর্ত দেন একজন মুসলিমকে মুখ্যমন্ত্রী করলে তিনি লালুপ্রসাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। অর্থাৎ, রাবড়ি দেবীকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে সরিয়ে লালুপ্রসাদ বিরোধী জনগণকেও তুষ্ট করা যাবে, আবার মুসলিম ভোটব্যাঙ্কও রক্ষা করা যাবে — এই ছিল পাশোয়ানের চাল। কিন্তু রাবড়ি দেবীকে মুখ্যমন্ত্রী রাখার প্রশ্নে লালুপ্রসাদ অনড় থাকেন। অর্থাৎ, সরকারি ক্ষমতার ওপর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দখলদারি তিনি ছাড়তে নারাজ। এহেন পরিস্থিতিতে বিহারে কংগ্রেস সুবিধা করতে পারছে না দেখে বিজেপি টাকার থলি আর মন্ত্রীত্বের টোপ নিয়ে আসরে নামে এবং ক্ষমতালোভী লোকজনশক্তি পার্টির বিধায়কদের ভাঙিয়ে নিয়ে নিজেদের শাসনাধীন ঝাড়খন্ডের গেস্ট হাউসে নজরবন্দী করে ফেলে।

বিধায়ক ভাঙিয়ে বিজেপি ক্ষমতা করায়ত্ত করে ফেলবে — বাস্তবে এই সম্ভাবনা দেখা দিতেই কংগ্রেস, নিজস্বার্থে তিন মাস জিইয়ে রাখা বিধানসভা তড়িঘড়ি রাজ্যপাল পদকে ব্যবহার করে এক কলমের খোঁচায় বাতিল করে দিয়েছে। বিজেপি কর্তৃক বিধায়ক বেচাকেনার যে কারণ কংগ্রেস দেখিয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়, কিন্তু কংগ্রেসের মুখে তা শোভা পায় কি? এই কংগ্রেসই নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করতে কোটি কোটি টাকা ঢেলে সাংসদ কিনেছিল যার মধ্যে ঝাড়খণ্ড দলের শিবু সোরেন ও জনতা দলের অর্জুন মুণ্ডার টাকা নেওয়ার ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। শিবু সোরেনের ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কাজেই বিধায়ক কেনাবেচা বন্ধের যে কথা কংগ্রেস বলেছে তা নিতান্তই অজুহাত। আসলে বিহারের ক্ষমতা বিজেপি যাতে নিতে না পারে এবং নিজেদের গদিতে বসার সুযোগ যাতে খোলা থাকে সেই নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য থেকেই কংগ্রেস বিহার বিধানসভা খারিজ করেছে।

জনগণকে বার বার ঠকতে হচ্ছে কেন?

বলাবাহুল্য এর জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হল বিহারের গরিব জনগণের। লালুপ্রসাদ-রাবড়ি দেবী সরকারের অপশাসন দূর করে সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার পাওয়ার জন্য তাঁদের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা তো পূরণ হলই না, বরং আবার একটি নির্বাচনের দায় তাঁদের কাঁধে চাপল। কেন এমন হল? কারণ লালুপ্রসাদের সরকারের দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ মানুষ, বুর্জোয়া গণমাধ্যমের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে গণআন্দোলনের পথে, গণআন্দোলনের সঠিক নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার পথে না গিয়ে, সংসদীয় রাস্তায় ভোটের মাধ্যমে মালিকশ্রেণীর সেবাদাস অপর জোট বা দলকে বেছে নিতে চেয়েছেন যারা দুর্নীতিতে ও ক্ষমতার লালসায় লালুপ্রসাদের চেয়ে কম নয়। অথচ একটু ভাবলেই তাঁরা দেখতে পেতেন — এই বিহার রাজ্যেই কংগ্রেসী ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে লাখে লাখে মানুষ যখন সরকারি বাধাকে তুচ্ছ করে আন্দোলনের ময়দানে নেমেছিলেন, তখন কিন্তু যাদব-ভূমিহার, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। ষাটের দশকের কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনেও একই ধরনের ঐক্য দেখা গিয়েছিল। উভয় আন্দোলনেই এস ইউ সি আই সর্বশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু নেতৃত্বকারী বৃহৎ দলগুলি ছিল বুর্জোয়া দল, আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় যাওয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য। আমাদের দল আন্দোলনের মধ্যে থেকেই বার বার দলবিচারের ক্ষেত্রে দলের শ্রেণীচরিত্র বিচারের প্রশ্নটিকে জনগণের সামনে আনার চেষ্টা করেছে। আমরা দেখিয়েছি, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জন সংঘর্ষ, ছাত্র সংঘর্ষ কমিটিগুলি বিহারের মাটিতে গড়ে উঠেছে সেগুলিকে উন্নত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগণের সংগ্রামের দীর্ঘস্থায়ী হাতিয়াররূপে গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রচারের ডামাডোলে আমাদের সঠিক বক্তব্য চাপা পড়ে গিয়েছে। লালুপ্রসাদ, নীতীশকুমার, রামবিলাস পাশোয়ান সহ যেসব নেতারা দেশের সামনে আজ বিহারকে বেইজ্জত করছেন, তাঁরা এই আন্দোলনের ফলেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই আজ তারা বুর্জোয়া সংসদীয় ক্ষমতায় বসে, চরম দুর্নীতিগ্রস্ত সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই জনবিরোধী নীতিগুলি রূপায়িত করছেন। তার ফলে যত তাঁরা জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন ততই নির্বাচনে জেতার জন্য তাঁরা সমাজবিরোধী বাহুবলীদের কাজে লাগিয়ে কারচুপির দ্বারা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন। এ ধরনের দলগুলির মধ্য থেকে কাউকে বিকল্প হিসাবে সমর্থন করলে তা হবে ফুটন্ত কড়াই থেকে সরাসরি আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সামিল। ক্ষমতালোভী নীতিহীন রাজনীতির অবসান একমাত্র সঠিক মার্ক্সবাদী দলের নেতৃত্বে উন্নত নৈতিকতার আধারে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই ঘটতে পারে, বিহারের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এই সত্যই আবার তুলে ধরেছে।

১০ জনে ৯ জনই স্কুলছুট

শিক্ষার প্রসার নিয়ে বড় বড় ভাষণ নেহাতই ভণ্ডামি

রাজ্যসভায় সম্প্রতি পেশ করা রিপোর্টে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা এক কথায় ভয়াবহ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ৯ জনই পড়া শেষ হবার আগেই স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় (টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১১-৫-০৫)। শুধু কি তাই ? দেখা যাচ্ছে যে, ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের এক বিরাট অংশ কোনদিন স্কুলের চৌহদ্দিই মাড়ায় না। সংখ্যায় এরাও প্রায় ৩.৫ কোটি। এছাড়াও যারা স্কুলে যায়, তাদের প্রায় ৩৫ শতাংশই পঞ্চমশ্রেণীতে পৌঁছানোর আগেই পড়া ছেড়ে দেয় (সূত্র ঃ ঐ)।

যেসব রাজ্যে এই স্কুলছুটদের সমস্যা অত্যন্ত ভয়াবহ সেগুলি হল বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়। এই চারটি রাজ্য ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তাদের পক্ষে ২০০৭ সালের মধ্যে ৬ -১০ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব নয়। তাদের আরও সময় দরকার।

তবে অন্যান্য রাজ্যের অবস্থাও তাই বলে খুব আশাপ্রদ নয়। খোদ পশ্চিমবঙ্গেই এই স্কুলছুটদের সংখ্যা প্রাথমিকে ২০.৪৩ শতাংশ। রাজধানী কলকাতায় তা আরও বেশি — ৪৮.৫৩ শতাংশ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১-৫-০৫)। অর্থাৎ খোদ কলকাতা শহরেই প্রাথমিক স্কুলে পড়া শেষের আগেই পড়াশুনার সাথে সম্পর্ক ঘুচে যাচ্ছে শতকরা প্রায় ৪৯টি শিশুর, যা এই ব্যাপারে সর্বভারতীয় গড়কেও রীতিমত লজ্জায় ফেলে দেবার ক্ষমতা রাখে।

অথচ সর্বশিক্ষা অভিযানের নামে প্রারম্ভিক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) নিয়ে তোলপাড় চলছে সারা দেশেই। এর পেছনে নানা মিটিংয়ে, আলোচনায়, সেমিনারে, প্রচারে খরচও হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ফল সবমিলিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রায় শূন্যই, সারা দেশের শিক্ষার চিত্র পড়ে রয়েছে সেই তিমিরেই। এই রাজ্যেও পরিস্থিতি প্রায় একইরকম। গত আর্থিক বছরে এই খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খরচ করেছে ১৯০০ কোটি টাকা। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার এই বাবদ দিয়েছে ৫৬১ কোটি টাকা (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১-৫-০৫)। এতদ্‌সত্ত্বেও পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি চোখে পড়েনি। শুধু তাই নয়, গত বছরের সরকারি কর্মসূচি 'স্কুল চলো' অভিযানে রাজ্যে যত শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা হয়, তাদেরও অনেকেই ইতিমধ্যেই স্কুল ছুট। মাঝে 'মিড ডে মিল'-এরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা স্কুলে নেই।

একদিকে সরকারি খরচের বহর বাড়ছে, অন্যদিকে চলেছে বড় সংখ্যায় স্কুলছুটও। আর এই দুই-এর আশ্চর্য সহাবস্থানের কোনও সদুত্তর সরকারি কর্তাদের কাছেও পাওয়া হয়ে উঠেছে দুষ্কর।

আসলে সমাজে ভয়াবহ দারিদ্র্যের সমস্যার সঙ্গে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার সমস্যাগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই আগে দারিদ্র্যের কোনও সমাধান না করে অশিক্ষাকে নির্মূল করা সত্যিই প্রায় অসম্ভব। কারণ, একটি অতি গরিব পরিবারের কাছে প্রায়শই একটি শিশুর স্কুলে যাওয়া বা পড়াশুনোর থেকে কিছু উপার্জন করতে পারাটা জীবন ধারণের জন্য অনেক বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে একটি শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার খরচ শুধু তার বিদ্যালয়ের বেতন নয়, সে শিশুশ্রমিক হিসাবে কাজ করলে যে অর্থ উপার্জন করতে পারত, তাও। আর ঠিক সেই আর্থ সামাজিক কারণের জন্যই এমনকী 'মিড ডে মিলের' বন্দোবস্ত করে তাদের স্কুলে ধরে রাখা প্রায়শই সম্ভব হয় না। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে এই ব্যাপারটি আরও বৃদ্ধি পায়। তাই এই ক্ষেত্রে স্কুলছুটের হারও হয় আরও বেশি। গ্রামাঞ্চলে খেত-খামারে যেমন এই বয়সের শিশুরা অনেক সময়েই শ্রম দিয়ে থাকে, শহরাঞ্চলেও এদের বয়সী শ্রমিকদের ভালই চাহিদা আছে। শুধু কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই নয়। শিলিগুড়ি, বর্ধমান বা আসানসোলের মত শহরেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে এইসব শিশুশ্রমিকরা প্রায়শই কাজ করে থাকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের সামনে স্কুল জীবনের ইতি ঘটানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা থাকে না।

শিক্ষাক্ষেত্রের এই ভয়াবহ অবস্থার পিছনে আরও একটি কারণ স্পষ্টতই দৃশ্যমান। তা হল শিক্ষার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর সীমাহীন অপ্রতুলতা। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সুবিধা, অর্থাৎ বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শৌচাগার, শ্রেণীকক্ষ, বোর্ড, বসবার আসন এবং ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যা না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনায় আগ্রহ হারাতে বাধ্য। 'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রভৃতির কল্যাণে বিভিন্ন সেমিনার, মিটিং, সরকারি পর্যায়ে বৈঠক বা প্রচার অভিযানে টাকার বন্যা বইতে থাকলেও, খোদ কলকাতা শহরেও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাবার জন্য মাসিক বরাদ্দ গড়ে এখনও মাত্র ২১৬ টাকা। এই টাকায় কোনও পরিকাঠামো আদৌ খাড়া করা যায় কি না, সেই বিষয়ে কোনও মন্তব্যই নিষ্প্রয়োজন। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে শিক্ষার অবস্থা আরও করুণ — ন্যূনতম বিদ্যালয় গৃহটিও সেখানে প্রায়শই অমিল।

আর তারই বিপরীতে দেখা যাচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে গড়ে ওঠা নানা মহার্ঘ বিদ্যালয়। সমাজের ধনী অংশ তাঁদের সন্তানদের এইসব বিদ্যালয়েই প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পড়ান। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রেও তৈরি হয়ে চলেছে স্পষ্টতই দুটি শ্রেণী। একদিকে রয়েছে বিত্তবান ঘরের শিশুরা, যারা বেসরকারি ব্যয়বহুল স্কুলে পড়ে পরবর্তী পর্যায়ের উচ্চশিক্ষার পথে সহজেই এগিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, একেবারে শুরু থেকেই তাদের জন্য সমাজে অবস্থান করে বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা, যা লাভ করার একমাত্র চাবিকাঠি হল অপরিমেয় বিত্ত। এরাই পরবর্তীকালে উপযুক্ত শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলিতে অধিষ্ঠিত হয়ে শ্রেণীশোষণ ভালভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে। অপরদিকে অবস্থান করে লক্ষ লক্ষ সাধারণ সঙ্গতিহীন ঘরের শিশুরা, যারা বাধ্য হয়েই সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং তারপরে হয় মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয় অথবা কোনক্রমে যদি তা চালিয়ে যেতেও পারে, একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছানোর পর প্রায়শই দেখে তাদের আর এগোনোর পথ রুদ্ধ — তা সে ইংরেজিতে দক্ষতার অভাবের জন্যই হোক বা পড়ার খরচ বহনের অক্ষমতার জন্যই হোক বা গরিব পরিবারে দু-বেলা অন্নসংস্থানের জন্য কাজ করতে বাধ্য হয়েই হোক।

আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার যে, স্কুলছুট যারা হয়, তারা কিন্তু কোনও না কোনও সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের পরিবারে শিক্ষার একটা চাহিদা আছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের চাপে তা ঢাকা পড়ে যেতে বাধ্য হয়। এখন তাঁরা যদি দেখেন পড়াশুনা করেও না পাওয়া সম্ভব কোনও চাকরি, না ঠিকমত জ্ঞানার্জন, তবে শিক্ষার প্রতি তাঁদের আগ্রহ হারানো স্বাভাবিক। আর কখনও ইংরেজি তুলে দিয়ে, কখনও ছাত্রদের উপর বোঝা কমানোর নামে অবৈজ্ঞানিকভাবে সিলেবাসের সঙ্কোচন ঘটিয়ে, ভাষাশিক্ষার ও সাহিত্যের গুরুত্ব পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে শিক্ষার সাথে জ্ঞানের সম্পর্ককে ক্রমাগত দূরবর্তী করে তোলার চেষ্টা যেভাবে হচ্ছে, তাতে সার্বজনীন শিক্ষার প্রসারে সরকারের আগ্রহ নিয়েই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নয় কি? আর সমাজে ভয়াবহ দারিদ্র্যের অবসানের সাথে যে শিক্ষার প্রসারের বিষয়টি সরাসরি যুক্ত, সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে যে প্রকল্পই ঘোষিত হোক বা যে অভিযানই চলুক এবং সেই বাবদ যত টাকাই উড়ুক, শেষপর্যন্ত তা নেহাতই এক প্রচারসর্বস্বতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য — যাতে কাজের কাজ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আজ প্রায় ৫৮ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু সেই ১৯৫০ সালে প্রণীত সংবিধানের ঘোষণামত ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্য থেকে আজও দেশ শত যোজন দূরে। প্রতিটি নির্বাচনের আগে ও পরে কেন্দ্রে-রাজ্যে প্রতিটি সরকারই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে একের পর এক সাড়ম্বর ঘোষণা করেছে। কিন্তু শেষে পরিস্থিতি পড়ে থেকেছে সেই তিমিরেই। আর এই অশিক্ষার পিছনে মূল কারণ যে দারিদ্র্য তারও উন্নতি হয়েছে সামান্যই। দেশজুড়ে উন্নয়নের যত বিজয়ডঙ্কা সবই গিয়ে শেষ হয়েছে পুঁজিপতিদের মুনাফার ঝুলিতে। এখন আবার দেশি পুঁজিপতিদের সাথে বিদেশি পুঁজিপতিদের আরও মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য পরিকাঠামো তৈরির নামে শেষ পর্যন্ত কিছু চকচকে রাস্তাঘাট, সেতু, উড়ালপুল, গাড়ি, গগনচুম্বী বহুতল ও শপিং মলের নির্মাণকেই 'উন্নয়ন' 'উন্নয়ন' বলে চেঁচিয়ে বাজিমাত করার চেষ্টা চলছে। অথচ সরকারি হিসাবেই দেশের ২৬ কোটি মানুষ (বাস্তবে অনেক বেশি) আজও দিন কাটায় অনাহারে, অর্ধাহারে।

এইসব পরিবারে শিশু-কিশোরের কাছে স্কুলের শিক্ষা তো একধরনের বিলাসিতা। বহুকাল আগেই কার্ল মার্কস বলেছেন, মানুষের বাঁচার জন্য প্রথমে চাই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, । এটা পাওয়ার পরই সেই মানুষ বৌদ্ধিক চর্চার কথা ভাবতে পারে। তাহলে যে সমাজব্যবস্থা দেশের কোটি কোটি পিতা-মাতা ও তার শিশুসন্তানদের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারে না, সেই পুঁজিবাদী সমাজের কর্তাদের মুখে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ভাষণ নির্লজ্জ ভণ্ডামি ছাড়া কিছু হতে পারে কি ! তাই যথার্থ দেশপ্রেমিক শিক্ষানুরাগী যে মানুষরা শিক্ষার প্রসার চান, তাঁদের অন্তত স্বাধীনতার ৫৮ বছর পর বোঝা দরকার যে, দারিদ্র্যের এই জমাট অন্ধকারের জন্য দায়ী পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা, যাকে ভাঙতে না পারলে শিক্ষার আলো কখনই গরিবের কুটিরে প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রাথমিকে বৃত্তি পেল ৫০২ জন

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ২৯ মে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয় ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল ও মানিক মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বক্তব্য রাখেন পর্ষদ সম্পাদক কার্তিক সাহা।

প্রায় সওয়া তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী এ বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মেদিনীপুর জেলার ছাত্রী কমলকলি মাইতি। ৪০০ নম্বরের মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৩। ৫০০ জন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এর মধ্যে রাজ্যস্তরে বৃত্তিপ্রাপক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫২ জন। তাদের মাসিক ১০০ টাকা হিসেবে এক বছরের জন্য ১২০০ টাকা প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে জেলাস্তরে বৃত্তিপ্রাপক ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে মাসিক ৫০ টাকা হিসেবে এক বছরের জন্য ৬০০ টাকা প্রদান করা হয়। বৃত্তির মোট অর্থমূল্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এই সঙ্গে বিশেষ প্রশংসাপত্রও এদের হাতে তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মহাশয়।

সভাপতির ভাষণে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন — শিক্ষার মানের উন্নয়নকল্পে এই পরীক্ষা এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একে আরও ব্যাপক করতে হবে। সরকার দাবি না মানলে আমাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে।

অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন — গ্রামে-গঞ্জে-শহরে সর্বত্র এই পরীক্ষা যেভাবে সাড়া জাগিয়েছে সরকারের উচিত অবিলম্বে সমস্ত দাবি মেনে শিক্ষায় সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

বিশিষ্ট বামপন্থী জননেতা মানিক মুখার্জী বলেন — এই পরীক্ষা আজ সর্বসাধারণের পরীক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। সরকারের উচিত অবিলম্বে দাবি মেনে নেওয়া, অন্যথায় সর্বস্তরের মানুষকে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

স্কুলে যৌন শিক্ষা চালুর প্রতিবাদে নাগরিক কনভেনশন

মছলন্দপুর রাজবল্লভপুর স্কুলে ২৯ মে স্কুলে যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে এলাকার ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের দুই শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনে ডাঃ এস দত্ত রায় বলেন, স্কুল স্তরে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠন, মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ পালন করার শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর করছে, অর্থ উপার্জনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। টিভি, ভিডিও, সিনেমায় নগ্ন যৌনতার প্রদর্শন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খারাপ প্রভাব ফেলছে। এর উপর স্কুলে মূল্যবোধহীন যৌনতার শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক মানকে ধ্বংস করে দেবে।

কনভেনশনে পান্নালাল চৌধুরী, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, ডাঃ রউফ মোল্লা ও ডাঃ হরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম ও গোপাল বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে শিক্ষক ভঞ্জবালা দে-কে সম্পাদক করে ১৫ জনের একটি সেভ এডুকেশন কমিটি গঠন করা হয়।

সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ কীসের জোরে দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল

(গত সংখ্যায় আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানবাহিনীর দ্বারা সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়ার ঠিক দশদিন পর বেতারে প্রদত্ত মহান স্ট্যালিনের ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রকাশ করেছি। মহান নেতার আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বলীয়ান দুর্ধর্ষ জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীকে শেষপর্যন্ত ঠিক কীসের জোরে এবং কেমনভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু সোভিয়েট ভূখণ্ড নয় — ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকেও ফ্যাসিস্ট-দখলমুক্ত করেছিল, সেদিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও জনগণের প্রতি নেতার আস্থা ও বিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল — সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সোভিয়েটের জনগণ সমাজতন্ত্র চায়নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙতে চেয়েছে, সেজন্যই সমাজতন্ত্র ভেঙেছে — এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী প্রচারের মোকাবিলায় আমাদের জানা দরকার কীভাবে সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছে। শোষিত জনগণ এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবীদের কাছে এ এক অমূল্য ইতিহাস — যা না জানলে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণাই অপূর্ণ থেকে যাবে, যা জানলে শোষণমুক্তির লড়াই আরো ধারালো হবে। এই লক্ষ্য থেকেই সেদিনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী)

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৬০ বছর পূর্তি দিবস ৮ মে উদ্‌যাপিত হল বিশ্বজুড়ে। ফ্যাসিস্ট জার্মানবাহিনীর সীমাহীন দম্ভ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক বিজয়ের কারিগর ছিল সোভিয়েট সমাজতন্ত্র, লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণ, এবং তার সেনাপতি মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতপুষ্ট জার্মানবাহিনী পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যান্ড, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস সহ প্রায় সমগ্র ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সোমালি, কেনিয়া, সুদান, লিবিয়া, মিশর — একের পর এক দেশ দখল করে এবং এই দেশগুলির সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে ১৯৪১ সালের ২২ জুন ঝঞ্ঝার গতিতে আক্রমণ হেনেছিল সোভিয়েটের উপর। একনাগাড়ে তিন বছর ধরে সোভিয়েট অবরুদ্ধ থেকেছে। যেখানে সমগ্র বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ গিয়েছিল প্রায় ৫ কোটি মানুষের, সেখানে শুধু সোভিয়েটেই হারিয়েছে তার ২ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ। গোটা সোভিয়েটে এমন কোনও পরিবার ছিল না যার কেউ না কেউ যুদ্ধে নিহত হয়নি। সেই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ শুধু মাত্র নিজেদের দেশকেই মুক্ত করেছে তাই নয়, মানবসভ্যতাকেও রক্ষা করেছে এক ভয়াবহ বর্বরতা ও দাসত্বের কবল থেকে। তারা জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কব্জা থেকে মুক্ত করেছে রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, গ্রীসের কিছুটা অংশ, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, ডেনমার্ক এবং উত্তর নরওয়েকে। এই দেশগুলিকে মুক্ত করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রোমানিয়ায় প্রাণ দিয়েছে লালফৌজের ৬৯ হাজারেরও বেশি সৈনিক, পোল্যাণ্ডে ৬০ হাজার, হাঙ্গেরিতে ১ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি, অস্ট্রিয়াতে প্রায় ২৫ হাজার এবং জার্মানীতে ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি সৈনিক। তাই যুদ্ধের শেষে বিশ্বের কোটি কোটি জনগণের চোখে সোভিয়েট লালফৌজ ও কমরেড স্ট্যালিন হয়ে ওঠেন ভরসা ও সংগ্রামী প্রেরণার উৎসস্থল, বিশ্বে গণতন্ত্র রক্ষার অগ্রগামী বাহিনী, বিশ্বশান্তির অগ্রদূত।

মানবতাবাদী ধারার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অভিনন্দন

সোভিয়েট ভূখণ্ডে যখন লালফৌজ এবং সোভিয়েট জনগণ মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন বিশ্বের মানবতাবাদী ধারার শ্রেষ্ঠ সন্তান — মনীষী রম্যাঁ রোলাঁ, শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন, সাহিত্যিক বার্নার্ড শ', বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কণ্ঠে উদ্বেগ, এই যুদ্ধে সোভিয়েটকে সহায়তা দেবার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে তাঁরা আহ্বান জানিয়েছিলেন। মনীষী রোম্যাঁ রোঁল্যা তখন আহ্বান জানাচ্ছেন ঃ ''…সমস্ত স্বাধীন মানুষকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, রাশিয়া আজ বিপন্ন এবং সে যদি ধ্বংস হয়ে যায় তখন কেবল পৃথিবীর মজুরেরাই শিকলে বাঁধা পড়বে না — কী সামাজিক কী ব্যক্তিগত সবরকমের স্বাধীনতাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্ব কয়েক যুগ পিছিয়ে যাবে। রুশ বিপ্লবের মত এত শক্তিশালী ও এতখানি সম্ভাবনাময় সামাজিক আন্দোলন বর্তমানে ইউরোপে আর হয়নি। আসুন, এর সাহায্যে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই''। ইতিপূর্বে ১৯৩৫ সালের এপ্রিলে গান্ধীজীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন, 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইউরোপে যদি ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে সে জাপানের সাথে হাত মেলাবে এবং সম্ভব হলে হাত মেলাবে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথেও, যাতে সোভিয়েট রাশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করা যায়। …আমাদের তাই সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়াকে রক্ষা করা। সামাজিক নির্মাণকাণ্ডের আশা ভরসার সে অপরিহার্য ভিত্তি।'

১৯৪২ সাল; আমেরিকায় বহু পূর্ব থেকেই সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন সহ সমস্ত প্রচারমাধ্যম কমিউনিস্ট ও সোভিয়েট বিদ্বেষে ভরপুর; আমেরিকার মানুষও সেই বিষে জর্জরিত। এতদ্‌সত্ত্বেও ম্যাসিডন স্কোয়ারের খোলামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন। ক্যামেরার সামনে নয়, নয় কোন অভিনয়ের ডায়লগ ; বরং অভিনয়ের চাইতেও মূর্ত হৃদয়-নিঙড়ানো আবেগে জনতার প্রতি তাঁর আকুল আবেদন ঃ 'আমি কমিউনিস্ট নই, সাধারণ মানুষ। আমি অনুভব করি, কমিউনিস্টদেরও হাত-পা কাটা গেলে ব্যথা পায়। এই মুহূর্তে যেকোন দেশের মত রাশিয়ার মা-ও কাঁদছেন — সন্তান তাঁর ফেরেনি। …রাশিয়ার রণক্ষেত্রেই আজ গণতন্ত্রের জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে। মিত্রশক্তির ভাগ্য আজ কমিউনিস্টদের হাতে। …আমরা কোন অজুহাতেই রাশিয়াকে হারাতে চাই না, কারণ সে-ই হচ্ছে গণতন্ত্র রক্ষার অগ্রগামী বাহিনী।' আমেরিকা জুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকায় ঘৃণা ছড়ানো শুরু হল — বলা হল, চ্যাপলিন কমিউনিস্ট দরদী। ১৯৪৭ সালে সেই ঘৃণা পূর্ণতা লাভ করল। তাঁর নামে চতুর্দিকে পোস্টার পড়ল — 'অকৃতজ্ঞ ও কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল চ্যাপলিন আমেরিকা থেকে দূর হটো, চ্যাপলিনকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দাও, বিদেশিটাকে লাথি মেরে এদেশ থেকে তাড়াও...ইত্যাদি। এর জবাবে চ্যাপলিন স্পষ্ট করে বললেন, 'আমি জানিনা, কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলতে আপনারা কী বলতে চাইছেন। আমি এটাই বলব যে, যুদ্ধের সময়ে আমি রাশিয়ার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলাম, কারণ — আমার বিশ্বাস — রণক্ষেত্রে আসল লড়াইটা তারাই লড়ছিল, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে এবং আমি মনে করি — আমার ধন্যবাদ তাদের প্রাপ্য।' শেষপর্যন্ত এই মহান শিল্পীকে আমেরিকা থেকে নির্বাসিত করা হয়।

"ফ্যাসিস্ত দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে ইউরোপের মুক্তি আমরা ছিনিয়ে আনবই"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ১৯৩১ সালে। স্ট্যালিন তখন দল ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা। তিনি সেখান থেকে লিখেছিলেন, '…আপাতত রাশিয়ায় এসেছি — না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। …হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনের বছরে জিতব বলে এরা পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ। পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হতো।' বলেছিলেন, 'সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার — বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয়নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্য জমি চাষ করে এসেছে, এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তাই নয়, জ্ঞানের জন্য আনন্দের জন্য মানবজীবনের যা কিছু মূল্যবান — সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে।' আরও বলেছিলেন, 'বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়। … বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা।' সেই সোভিয়েট ও বলশেভিক নীতি যখন ফ্যাসিস্ট জার্মানীর আক্রমণে বিপর্যস্ত হচ্ছে তখন কবি রোগশয্যায় — মৃত্যুশয্যায়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখছেন, 'জার্মানী যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, অসুখের মধ্যেও বারবার খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারেবারে বলেছেন, সবচেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে। সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ, মুখ ম্লান হয়ে যেত, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলায় অপারেশনের আধঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা। — রাশিয়ার খবর বলো। বললুম, একটু ভাল মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে, ওরাই পারবে।' ১৯৪১ সালের ২৯ জুলাই হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় বড় হরফে প্রকাশিত হল 'সোভিয়েটের বিরাট জয়, নাৎসি পদাতিক বাহিনী পর্যুদস্ত, ১৩৪টি জার্মান যুদ্ধ-বিমান ভূপতিত।' পরদিন রবীন্দ্রনাথের অপারেশন। নির্মলকুমারী মহলানবীশ 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে লিখছেন — সকালে অপারেশনের আগে 'যুদ্ধজয়ের খবর শুনে কবির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, ভারী অহংকার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং। গোয়েরিং। এখন দেখুক গোয়েরিং, কি হয়। …রাশিয়ানরা খুব বীরত্ব দেখাচ্ছে, অসম্ভব লড়ছে। মুখ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল।' যুদ্ধরত রাশিয়ার প্রতি গভীর উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিল বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কণ্ঠেও। তাঁর নেতৃত্বে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষরিত জনগণের প্রতি আবেদন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪১-এর ২০ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ সরকারের সিঙ্গাপুর বেতার কেন্দ্র থেকে বলেছিলেন, 'আজ যদি ইউরোপে এমন কোনও একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন যাঁহার হাতে আগামী কয়েক দশকের জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য ন্যস্ত হইবে তিনি হইলেন মার্শাল স্ট্যালিন। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়ন কী করে না-করে তাহার দিকে সর্বাধিক আগ্রহ লইয়া গোটা বিশ্ব এবং সর্বোপরি গোটা ইউরোপ তাকাইয়া থাকিবে।'

কমিউনিস্ট না হলেও সাহিত্যিক বার্নার্ড শ' কমিউনিজম, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মহান নেতা স্ট্যালিন সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। বলেছিলেন, 'রুশ রাষ্ট্রবিদ্‌রা আবিষ্কার করেছেন সত্যিকারের স্বাধীন দেশ — যেখানে দেশের মালিক সত্যিই জনসাধারণ, … কমিউনিজম বেয়াড়া ডিক্টেটরশিপ অথবা কমিটি অফ পাবলিক সেফটি সৃষ্টি করে না। …কমিউনিজম সৃষ্টি করে একটা আত্মত্যাগী গণতান্ত্রিক সেবক সম্প্রদায়, এরা গড়ে তোলে গণতান্ত্রিক সংঘ ও শাসনব্যবস্থা, পেছনে থাকে একটা সার্বজনীন প্রেরণা এবং নির্লোভ পবিত্রতার সঙ্কল্প।' (বার্নার্ড শ', জে ভি স্ট্যালিনের সহিত সাক্ষাৎকার)। ১৯৪৮ সালে ১৪ মার্চ এলানার ও' কনেল সাহিত্যিক বার্নার্ড শ'-এর সঙ্গে দেখা করতে যান। শ' তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তুমি আমেরিকা যেতে চাইছ? কনেল উত্তর দেন, 'আমি ইংলণ্ডে যে স্বাধীনতা পাচ্ছি, তার থেকে বেশি স্বাধীনতা পেতে চাই বলে।' শ' জবাব দিলেন, 'পৃথিবীতে একটিমাত্র দেশ আছে যেখানে তুমি সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে পারো — তার নাম রাশিয়া, যেখানে মহান স্ট্যালিন বেঁচে আছেন।' (জি বি এস — এ পোস্টস্ক্রিপ্ট, হেসকিথ পিয়ার্সন)।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, নিজে ইহুদি পিতার সন্তান হওয়ার অপরাধে নাৎসি বাহিনীর অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি, তিনি লিখছেন ঃ 'নাৎসি সন্ত্রাস যখন ছড়িয়ে পড়ল, প্রধানত ইহুদিদের বিরুদ্ধে, তখন বাকী বিশ্ব দেখতে লাগল উদাসীন দৃষ্টিতে। …হিটলার যখন রুমানিয়া ও হাঙ্গেরিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল …এবং গ্যাসচেম্বারে নৃশংস হত্যার কাহিনী সমগ্র বিশ্ব জেনেও গেল, তখনও রুমানিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি বংশোদ্ভূতদের রক্ষার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল, কারণ প্যালেস্টাইনে ইহুদি উদ্বাস্তুদের ঢোকার দরজা বৃটিশ সরকার বন্ধ করে দিল…। কিন্তু আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

আটের পাতায় দেখুন

ইউ পি এ সরকারের এক বছর

একের পাতার পর

বাড়িয়েছে। মালিকশ্রেণীরই স্বার্থরক্ষাকারী অন্য একটি দল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারও একই পথে হেঁটেছে। তাদের শাসনেও জনগণের দারিদ্র, বেকারি ও দুর্দশা বেড়েছে প্রবল হারে। ধর্ম ও হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে সমস্যাজর্জরিত মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে বিজেপি চাপা দিতে পারেনি। 'ভারত উদয়'-এর মিথ্যা প্রচারে গরিব-মধ্যবিত্তকে ভোলানো যায়নি। সেই সুযোগে আবার ফিরে এসেছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ পি এ। কংগ্রেসের চরিত্র এদেশের মানুষের কাছে অজানা নয়। বিজেপি সরকারে থাকার সময়ও কংগ্রেস কখনই মালিকশ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি। নরসিমা রাও-এর নেতৃত্বে কংগ্রেসই এদেশে সংস্কারের নামে পুঁজিবাদী উদারনীতির কাজ শুরু করেছিল, যার প্রধান কারিগর ছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং, যিনি এখন প্রধানমন্ত্রী। এই পুঁজিবাদী সংস্কারের মুখ্য বিষয় ছিল প্রধানত জনপরিষেবা ক্ষেত্রে ভরতুকি হ্রাস করে মালিকদের আরও বেশি বেশি করে ছাড় ও ভরতুকি দেওয়া, সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি ক্ষেত্রগুলি জলের দামে বেসরকারি মালিকদের হাতে তাদের মুনাফা লোটার জন্য তুলে দেওয়া, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী পুঁজির অবাধ চলাচলের নীতিতে ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিকম, খনি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের অনুমতি দেওয়া ইত্যাদি। নরসিমা রাও সরকারের আমলে এই নীতি কার্যকর হয়েছে, পরবর্তীকালে বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারও এই নীতিতেই চলেছে। এন ডি এ-কে হটিয়ে আসা মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আচরণ অন্য রকম হবে — কোন সচেতন মানুষ তা মনেই করেনি। সেজন্য সরকারকে সমর্থনের প্রশ্নে সিপিএম-সিপিআই-এর মতো দলগুলি লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে দেশের মানুষকে বোঝাতে নেমেছিল যে, এই কংগ্রেস পুরানো কংগ্রেস নয়, এরা ভাল, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ; বিশেষ করে সিপিএমের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল এই সরকার জনগণের কল্যাণ না করে পারে না।

সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কলকাতায় সভা করে বলেছিলেন, ''আমরা চেয়েছিলাম বামপন্থীরা কেন্দ্রে নীতি নির্ধারক শক্তি হোক, তা হয়েছে। আমাদের সমর্থনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন যে সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকার আমরা হ্যাঁ বললে এগোবে, আমরা না বললে দাঁড়িয়ে থাকবে, এক পাও এগোতে পারবে না'' (গণশক্তি, ২৪-০৫-০৪)। সিপিএমের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে ইউ পি এ সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি বলে যেটা তৈরি হয়েছিল, সে সম্পর্কে সিপিএম প্রধান হরকিষেণ সিং সুরজিৎ বলেছিলেন, ''কেন্দ্রের যে অভিন্ন কর্মসূচি তৈরি হয়েছে, তা আমরা অনুমোদন করেছি। কৃষক মজুরদের সমস্যা নিয়ে একটি পুঁজিবাদী দলকে এভাবে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে আগে কখনও দেখা যায়নি' (গণশক্তি, ৪-০৬-০৪)। তিনি আরও বলেছিলেন, ''মনমোহন সিং সরকার আন্তরিকভাবেই ঐ কর্মসূচি রূপায়ণের যে চেষ্টা চালাবে তা নিয়েও আমাদের কোন সংশয় নেই।'' অর্থাৎ কংগ্রেস একটি পুঁজিবাদী দল ঠিকই, তবে সিপিএম এই সরকারের ক্ষেত্রে এতই ক্ষমতাধর যে, কংগ্রেসের মত দলকেও, তার শ্রেণীচরিত্র ভুলে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে কর্মসূচি নিতে বাধ্য করেছে এবং তা যে বাস্তবে কার্যকর হবে, তার গ্যারান্টিও সিপিএম দিচ্ছে। এখন, এক বছর পর, বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে সিপিএম দায় অস্বীকার করে চালাকি দেখালেও, ইতিহাস থেকে তাদের পুরানো কথাগুলি মুছে যাবে না। দেখা যাক গত এক বছরে ইউ পি এ যা করেছে তা শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষের, না শুধুমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণীর — কাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

বেকার সমস্যা

বেকারী আমাদের দেশে একটি প্রধান সমস্যা। পূর্বতন এন ডি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি বছরে এক কোটি বেকারের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কার্যক্ষেত্রে এন ডি এ সরকারি সমস্ত স্তরে নিয়োগ বন্ধ করেছিল এবং পাঁচ বছরে ১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বর্তমান ইউ পি এ আমলেও নিয়োগ বন্ধের সিদ্ধান্ত বহাল রয়েছে, অব্যাহত রয়েছে কর্মী সংকোচন। অথচ ইউ পি এ নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রতি পরিবারে একজনের চাকরির ব্যবস্থা করবেন। অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতেও কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গ্রামীণ বেকারদের বছরে ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করবে। যদিও বছরের বাকি ২৬৫ দিন সেই মানুষগুলির কাজের কী ব্যবস্থা হবে তার কোন উত্তর ঐ নেতারা দেননি। তবুও প্রতিশ্রুতি মত ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থাটুকুও করা তো দূরের কথা, এ সংক্রান্ত বিলটিই এখনও সংসদে পেশ করতে পারেনি সরকার। পুঁজিবাদী সংস্কারের ঝোড়ো হাওয়ায় এখন দপ্তরে দপ্তরে চলছে কর্মসংকোচন ও পদ বিলোপ। অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম সম্প্রতি জানিয়েছেন, 'এক্সপেন্ডিচার রিফর্ম কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী ১৮ হাজার ৬৮২টি পদ ইতিমধ্যে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরও ৯৮ হাজার পদ বিলুপ্তির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পরেও কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলে চলেছেন, 'উন্নয়ন কর্মসূচিগুলির মূল লক্ষ্য হবে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান।' এখন অবশ্য কর্মসংস্থান বলতে সরকার সকল বেকার যুবককে স্বনিযুক্তির নামে 'ব্যবসা' করার পরামর্শ দেয়, নিজের পথ নিজে করে নেওয়ার জন্য জ্ঞান দেয়। এজন্য এসব প্রকল্পে কিছু অর্থ বরাদ্দও করে, যা বলাই বাহুল্য, মরুভূমিতে বারিবিন্দুর মতো। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বামপন্থীদের কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। অবশ্য সে উপায়ও তাদের নেই। তারা নিজেরা এ রাজ্যে যে হারে ছাঁটাই শুরু করেছে তাতে ইউ পি এ-ও লজ্জা পাবে।

কৃষকদের অবস্থা

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের বেশিরভাগ মানুষ আজও কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। অথচ কৃষিক্ষেত্রে এন ডি এ আমলের মতোই বৃহৎ পুঁজির দাপট ইউ পি এ আমলেও সমান অব্যাহত। সার বীজ সেচ কীটনাশক সহ সমস্ত কৃষি সরঞ্জামের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি ঘটেই চলেছে। ফলে চাষের খরচ বেড়েছে বহুগুণ। নিম্ন ও নিম্ন-মধ্য চাষীরা এই খরচ যোগাতে না পেরে ঋণ করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ ফসলের দাম নির্ধারণের ক্ষমতা কৃষকের হাতে নেই। তা বহু আগেই কৃষিপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে। এই ব্যবসায়ীরা ফসল ওঠার মরসুমে কম দামে গরিব চাষীদের ফসল বেচতে বাধ্য করে এবং ঐ ফসল গুদামজাত করে অন্য সময়ে চড়া দামে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে। ফলে চাষীরা চাষের খরচটুকুও তুলতে না পেরে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে ; দ্বিতীয়ত, সরকারি ভরতুকি এখনও যতটুকু বরাদ্দ আছে তার বেশিরভাগটাই চলে যাচ্ছে কৃষি ও শিল্প পুঁজিপতিদের পকেটে। সারে ভরতুকির সুবিধাটুকু পাচ্ছে সার উৎপাদনকারী বৃহৎ পুঁজির মালিকরা— তার সুফল গরিব কৃষকের কাছ অবধি পৌঁছায় না। পূর্বতন কংগ্রেস এবং পরবর্তীকালে এন ডি এ রেশন ব্যবস্থাটিকে প্রায় ভেঙে দেওয়ার ফলে এবং বহু প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ইউ পি এ সরকার রেশন ব্যবস্থার কোন উন্নতিই না ঘটানোর ফলে এই ভরতুকির সিংহভাগই আত্মসাৎ করছে বৃহৎ কৃষি ব্যবসায়ী এবং ধনী চাষীরা। তাই এই বৃহৎ পুঁজির মালিকরা বর্ষপূর্তিতে সরকারকে যখন দরাজ হাতে সার্টিফিকেট দিচ্ছে, তখন ঋণে জর্জরিত, চরম অভাবগ্রস্ত, ফসলের ন্যূনতম দাম না পাওয়া কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা দেশব্যাপী বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। গরিব ও প্রান্তিক চাষীরা তো বটেই, এমনকী মধ্য চাষীরাও ক্রমেই অভাবের তাড়নায় জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে দিনমজুরে পরিণত হচ্ছে, কাজের আশায় গ্রাম থেকে শহরে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এদের দৈনিক জীবনযাপনে 'উন্নয়নের' বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই। 'উন্নয়ন' হচ্ছে তাদের যারা এদের জমি হাতিয়ে নিয়ে বিশাল জোতের মালিক হয়ে জমিকে বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র করে তুলেছে। কংগ্রেস সরকারের 'সি এম পি' যদি কৃষকদের স্বার্থেই তৈরি হয়ে থাকে, তবে গরিব ও মধ্যচাষী, যারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের হাল গত এক বছরে সামান্য হলেও ভাল হওয়ার কথা। তার চিহ্নমাত্র নেই কেন? কেন কৃষি মজুরদের অবস্থা দিনে দিনে আরও শোচনীয় হচ্ছে! সিপিএম নেতারা কি জবাব দেবেন ?

গ্রামোন্নয়ন

ইউ পি এ সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় নাকি রয়েছে গ্রামোন্নয়ন। এ বছরের বাজেটকে 'গ্রামমুখী' বলেও শাসক দল এবং সংবাদমাধ্যমগুলি হৈ চৈ তুলে দিয়েছিল। এই খাতে বাজেটে বরাদ্দবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে সিপিএম একে এমনকী সরকারের অভিমুখ পরিবর্তন বলে ঘোষণা করেছিল। ''কর্মসংস্থান বিকাশ, বিশেষ করে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ ইত্যাদি যে গুরুত্ব পেয়েছে তাতে অভিমুখের পরিবর্তন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে পলিটব্যুরো'' (গণশক্তি, ০১-০৩-০৫)। অথচ, অনেকেরই স্মরণে আছে, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিং বাজেটের একদিন পরেই একে অর্থমন্ত্রীর 'স্রেফ ধোঁকা' এবং 'অঙ্কের খেলা' বলে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সরকারের বর্ষপূর্তি স্পেশাল হিসাবে বহু ঢক্কানিনাদ সহকারে প্রধানমন্ত্রী 'ভারত নির্মাণ' প্রকল্পের অনুমোদন ঘোষণা করেছেন। এই খাতে তিনি ১ লক্ষ ৭৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে সেচ, বিদ্যুৎ, টেলি যোগাযোগ, সড়ক, পানীয় জল এবং আবাসন। অথচ এবারও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিং অর্থমন্ত্রীর সমালোচনা করে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, ভারত নির্মাণ প্রকল্প বাবদ এক পয়সাও অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়নি। তিনি জানিয়েছেন, বস্তুত গ্রামীণ এলাকায় ওই ছয়টি কর্মসূচির মধ্যে সড়ক, পানীয় জল এবং আবাসন প্রকল্প তাঁর দপ্তরের আওতায় পড়ে। তিনি জানান, এই প্রকল্প নতুন কিছু নয়। পুরানো প্রকল্পগুলিকেই ভারত নির্মাণের নতুন মোড়ক লাগিয়ে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে এই কাজগুলি ইতিমধ্যেই চলছে। বরং তিনি বলেন, গ্রাম সড়ক যোজনায় পরিকল্পনা মতো সব গ্রামে সড়ক যোগাযোগ গড়ে তুলতে ৪৮ হাজার কোটি টাকা লাগবে। এর মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ থেকে আসার কথা। যদিও বেশিরভাগ সময়ে ঘোষিত বরাদ্দের সব টাকা বাস্তবে দেওয়া হয় না। ১০ হাজার কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও এ ডি বি থেকে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাকি ১৮ হাজার কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে ভারত নির্মাণে তার কোন সংস্থান রাখা হয়নি। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতেও অবস্থার কোন ইতরবিশেষ নেই।

ইউ পি এ সরকারের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প যে একটি চূড়ান্ত প্রতারণা, তা আজ এতখানি স্পষ্ট যে সিপিএম সম্পাদক প্রকাশ কারাতকেও বলতে হচ্ছে, ''সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচির অভিমুখ এখনও উদারিকরণ ও বেসরকারীকরণের দিকেই। ইউ পি এ সরকারের এক বছরে বোঝা গেছে, কংগ্রেস পরিচালিত এই সরকার তার শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ীই চালিত হচ্ছে'' (গণশক্তি, ২৭-০৫-০৫)। তাহলে কারাত সাহেবরা চিদম্বরমের বাজেটের মধ্যে উন্নয়নের অভিমুখ পরিবর্তন দেখেছিলেন কী করে ? এরপরও তারা পুনরায় ইউ পি এ-কে পূর্ণ সময়ের জন্য নিঃশর্ত সমর্থন ঘোষণা করলেন কোন শর্তে! এটা বিরোধিতার ভান নয় কি? সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে আটকানোর যুক্তিটা ক্রমেই ছেঁদো বলে প্রমাণ হচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের উপর কেন্দ্রের সরকার ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক আক্রমণ চালালেও সিপিএম নকল প্রতিবাদের অভিনয় ছাড়া বাস্তবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে না। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে সিপিএমের বোঝাপড়াটি চমৎকার, যদিও তা এখন আর গোপন থাকছে না, জনগণও সেটা ধরে ফেলছে।

বিদ্যুতায়ন

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইউ পি এ ঘোষণা করেছে, আগামী পাঁচ বছরে সব গ্রামে সব বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। বাস্তবে ইউ পি এ কী করছে? বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ আমলে যে বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ প্রণীত হয়েছিল, যা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সামগ্রিক বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্যেই রচিত তাকেই ইউ পি এ কার্যকর করছে। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে ভেঙে তিনটি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া, পারস্পরিক ভরতুকি তুলে দেওয়া, মাশুল বাড়ানো, গ্রাম ও শহরের বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা আলাদা করে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের দায় ঝেড়ে ফেলা প্রভৃতি। তাই গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতা হলেও বাস্তবে তা গ্রাম জীবনের অন্ধকার দূর করতে পারবে না। কারণ এই মহার্ঘ বিদ্যুৎ কেনার মত ক্ষমতা গ্রামের কোটি কোটি গরিব মানুষের নেই। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সরকারের এই চূড়ান্ত জনবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে সম্প্রতি দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বিদ্যুৎকর্মী ও ইঞ্জিনিয়ারদের সমন্বয় সংগঠন। অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার কথা, সিপিএম ও সিপিআই নেতৃত্বের আপসকামী ভূমিকার জন্য শুধুমাত্র বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি ভেঙে দেওয়ার সময়কাল ৬ মাস বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এতবড় আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল— যা এক কথায় দেশের সাধারণ মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য সিপিএমও এ রাজ্যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে এই চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ নীতিকেই দক্ষতার সাথে কার্যকর করছে।

শ্রমক্ষেত্র

শ্রমক্ষেত্রে পরিস্থিতিটি বোধহয় ইউ পি এ আমলে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছে। গত এক বছরে কয়েক হাজার কারখানা বন্ধ হয়েছে, কয়েক লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে। ব্যাঙ্ক সহ সরকার অধিগৃহীত প্রায় সমস্ত সংস্থাতেই সংস্কারের নামে চলছে অবাধে বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছাবসর ; নিয়োগ যতটুকু হচ্ছে তার প্রায় সবই চুক্তিতে। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। এবারে মন্ত্রী হওয়ার পর বুদ্ধদেববাবুদের নতুন উপলব্ধি হয়েছে যে, চুক্তিতে না হলে শ্রমিকদের থেকে নাকি কাজ পাওয়া যায়না। শিল্প বিরোধ আইন সংশোধনের মধ্য দিয়ে সরকার অবাধ ছাঁটাইকে আইনসিদ্ধ করতে চলেছে। অন্যদিকে চলছে শ্রম-আইন সংশোধনের প্রস্তুতি। যা সম্পন্ন হলে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকারই প্রায় কেড়ে নেওয়া হবে। স্থায়ী চাকরি বলে আর কিছু থাকবে না। সংস্কারের নামে কর্মসংকোচন আরও অবাধে ঘটতে থাকবে।

সাতের পাতায় দেখুন

সিপিএম-সিপিআই নেতাদের পাক সফরে

পাকিস্তানের বামপন্থীরা হতাশ

সিপিএম ও সিপিআই দলের দুই সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে হরকিষেণ সিং সুরজিৎ ও এ বি বর্ধন কিছুকাল আগে পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। ভারতের সংবাদমাধ্যমে সে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, পাকিস্তানেও হয়েছিল। সেই সফরের ফলাফল সম্পর্কে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে কিছু কথা জানিয়েছেন ওদেশের একজন বুদ্ধিজীবী আসিম সাজ্জাদ আখতার। ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকায় (৯-৪-০৫) একটি নিবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে, ভারতের দুই বৃহৎ বামপন্থী পার্টির নেতাদের পাক সফরের সংবাদ পাকিস্তানের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বেশ আলোড়ন জাগিয়েছিল। তাঁরা আশা করেছিলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতবর্ষে যে দুটি বামপন্থী দল সরকারি ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের জায়গা পাকাপোক্ত করে নিচ্ছে, সেই দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের বামপন্থীরা নিজেদের দেশে বামপন্থী রাজনীতিকে শক্তিশালী করার পথের সন্ধান পাবেন। কিন্তু তাঁরা হতাশ হয়েছেন।

আসিম আখতার জানাচ্ছেন যে, সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবর পাকিস্তানকে এই অঞ্চলে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, যার ফলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের উপর বারবার যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের আঘাত নেমে এসেছে, তেমনই পাক রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের মুখেও তাদের পড়তে হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে ধর্মান্ধ দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান বামপন্থী রাজনীতির পক্ষে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করেছে। এসব সত্ত্বেও তাঁর লেখা থেকে মূল যে কথাটা পরিষ্কার বোঝা যায়, তাহল, আদর্শগত ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও বিভ্রান্তি পাকিস্তানি বামপন্থীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে।

যার ফলে ১৯৯১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের ধাক্কা ওদেশের বামপন্থীরা সামাল দিতে পারেননি, তাঁরা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে আরও দুর্বল হয়েছেন। উনি জানাচ্ছেন যে, পাকিস্তানের যুব সমাজের বর্তমান প্রজন্ম বিংশ শতাব্দীতে বিপ্লবী বামপন্থার ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই অবস্থায় বহু পুরানো বামপন্থী কর্মী ও সোভিয়েটের পতনের পরেও যেসব বামপন্থী কর্মী সক্রিয় আছেন, তাঁরা খুবই আশা করেছিলেন যে, ভারতের এই শীর্ষ দুই বামপন্থী নেতার সফর পাকিস্তানি বামপন্থীদের উজ্জীবিত করবে, নতুন করে কাজ শুরু করতে প্রেরণা জোগাবে। অবশ্য পাকিস্তানের বামপন্থীরা জানতেন না যে, ঠিক কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের দুই শীর্ষ বামপন্থী নেতা পাকিস্তানে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্যটা তাঁরা বুঝতে পারলেন যখন দেখলেন, ভারতের 'শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি' হিসাবে যাদের উচিত ছিল পাকিস্তানের 'শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি'দের সঙ্গে গভীর ও বিস্তৃত যোগাযোগ ঘটানো, আন্তরিক আলোচনায় লিপ্ত হওয়া, সেখানে বামপন্থীদের সঙ্গে নয়, পাকিস্তানের সামরিক শাসনের প্রতিভূ পারভেজ মুশারফ ও শওকত আজিজ-এর মতো রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করতেই সময় গেছে সিপিএম ও সিপিআই সাধারণ সম্পাদকদের। আসিম অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বামপন্থীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐ দুই বামপন্থী নেতা যতটুকু মেলামেশা করেছেন, তা করেছেন বিভিন্ন প্রকাশ্য সভায়, নিজেদের মধ্যে কোনও ধরনের একান্ত আলাপ-আলোচনার পথে আদৌ যাননি তাঁরা। ভারতবর্ষের বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সিপিআই-সিপিএম জন্মলগ্ন থেকে শুধু যোগদান করেছে তাই নয়, ধীরে ধীরে সংসদীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। সেই দল দুটির নেতারা, পাকিস্তানের বামপন্থীরা সামরিক শাসনের অধীনে নিপীড়িত হয়ে কীভাবে দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেই আপাত লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, সে বিষয়ে জানতে বিন্দুমাত্র আগ্রহও দেখাননি। এমনকী সরকারি বৈঠকগুলিতেও সিপিএমের হরকিষেন সিং সুরজিৎ ও সিপিআই-এর এ বি বর্ধন সেদেশের রাজনীতি ও সামরিক শাসন সম্পর্কে সামান্যতম সমালোচনাও অতি সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছেন; সেখানে তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনেক কড়া কথা বলেছেন, অথচ 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র নাম করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে যে হানাদারি চালাচ্ছে, সে ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের নির্লজ্জ সহযোগিতার বিষয়টি সম্পর্কে একটি নিন্দা-বাক্যও উচ্চারণ করেননি। গ্যাস-সমৃদ্ধ বালুচিস্তানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সম্প্রতি যে বাড়াবাড়ি করেছে, এমনকী সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলেও এ বি বর্ধন — 'এটি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন।

আসিম আখতার জানিয়েছেন, পাকিস্তানের যেসমস্ত বামপন্থী মানুষ সিপিআই-সিপিএম নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে হয়েছে, এই সফর ভারতবর্ষের 'কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রতিনিধিদের পাকিস্তান সফর নয়। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, এ সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় স্তরে কূটনৈতিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করা, সীমান্তের দু'পারের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের ঐক্যসাধন করা নয়।

সি পি এম-সি পি আই নেতাদের এই ভূমিকায় পাকিস্তানের বামপন্থীরা বেদনাহত হয়েছেন ঠিকই, তবে তাঁরা যদি ভারতবর্ষে এই দুটি দলের কেবলমাত্র বড় আকার ও পার্লামেন্টে সদস্যসংখ্যা দেখে বিচার না করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিচারধারায় তাদের ভূমিকা ও প্রকৃত চরিত্র বিচার করতেন, তাহলে তাঁরা আগেই বুঝতে পারতেন যে, নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও সি পি এম-সি পি আই উভয় দলের মধ্যেই কমিউনিজমের আদর্শের লেশমাত্রও নেই। সি পি আই একটি কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র নিয়ে গড়েই ওঠেনি, ঐ দল ভেঙে তৈরি সি পি এম-ও একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের লেনিনীয় পদ্ধতি কখনই অনুসরণ

আটের পাতায় দেখুন

ইউ পি এ সরকারের এক বছর

ছয়ের পাতার পর

দ্বিতীয়ত, মালিকশ্রেণীর আগ্রাসী ভূমিকার ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকারও আজ বিপন্ন। সর্বত্রই বাড়ানো হচ্ছে কাজের চাপ, এমনকী কাজের সময়ও। নির্দিষ্ট মাইনে, মহার্ঘ ভাতা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশনের মতো অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদের হার সরকার শেষ পর্যন্ত ৯.৫ শতাংশ করতে রাজি হলেও, সকলেই জানেন, এই বাড়তি সুদের বোঝা সরকার বইবে না— শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের জমানো টাকা থেকেই এই বর্ধিত সুদের টাকা মেটানো হবে। পেনশন তহবিলের বেসরকারীকরণের জন্য সরকার বিল এনেছে। কনট্রিবিউটরি পেনশন চালুর মধ্য দিয়ে পেনশন ব্যবস্থাটিকেই বিপন্ন করে তুলছে সরকার। অথচ একজন শ্রমিক বা কর্মচারী যে কোনও ধরনের সামাজিক উৎপাদনের কাজে জীবনের বৃহৎ অংশ তথা সবচেয়ে মূল্যবান অংশ যে নিয়োজিত করে, তার স্বীকৃতিস্বরূপই এই সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। এটি শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা তথা অধিকার— কোনও সরকারের দয়ার দান নয়।

বিলগ্নি ও বিদেশি পুঁজি

ইউ পি এ টেলিকম শিল্পে ৭৪ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগকে অনুমোদন দিয়েছে। খনি শিল্প ও খুচরো ব্যবসাকে বিদেশি পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বিমা, যাত্রী বিমান পরিবহণ, নন-ন্যাশানালাইজড ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, যা বাস্তবে দেশবাসীর ভাগ্য কর্পোরেট সংস্থাগুলির কৃপার উপর ছেড়ে দেওয়ারই সামিল। আসলে এ সবই পরিষেবার ক্ষেত্রে পূর্ণ বেসরকারীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের যে আন্তর্জাতিক চুক্তি (GATS) — যা কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সকলেই মেনে চলেছে, সেই অনুসারেই ঘটছে।

স্মরণ করা দরকার যে, ইউ পি এ গঠিত হওয়ার পর, এন ডি এ প্রবর্তিত বিলগ্নিকরণ দপ্তর তুলে দিতে সরকার তাদের চাপেই বাধ্য হয়েছে বলে অনেক হম্বিতম্বি করেছিল সিপিএম। কিন্তু দপ্তরের অভাবে সরকারি সংস্থা বিলগ্নিকরণ করতে আটকায়নি ইউ পি এ-র। এমনকী লাভজনক শিল্পের বেসরকারীকরণ করা হবে না বলে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাও ভঙ্গ করে 'নবরত্ন' বলে কথিত লাভজনক সংস্থাগুলির একটি 'ভেল'-এর দশ শতাংশ শেয়ার বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সরকার। আগামীদিনে আরও ৩৫ থেকে ৪০টি সরকারি সংস্থার বেসরকারীকরণের কথাও ভেবে রেখেছে সরকার। সরকারি সংস্থা ভেল-এর ১০ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা সরকার ছেড়ে দিয়ে বাইরের কাউকে বিক্রি করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে তার বিরুদ্ধে সিপিএম একটা গরম বিবৃতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শোনা যাচ্ছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডে ৯.৫ শতাংশ সুদ দেওয়ার বিনিময়ে (অবশ্য শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ভেঙে) ভেল-এর শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত আগেই সিপিএম মেনে নিয়েছে। এভাবে একটা লেন-দেন আগেই হয়ে গিয়েছে, বাইরের বিরুদ্ধতা নিতান্তই সাজানো।

বিদেশনীতি

বিদেশ নীতির প্রশ্নেও ইউ পি এ সরকার এন ডি এ-র পথেই চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্ট্র্যাটেজিক এবং সামরিক সহযোগিতার সম্পর্ক ইউ পি এ সমানভাবে বজায় রেখেছে। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার পক্ষে ভারতীয় জনগণের দীর্ঘ ঐতিহ্য সত্ত্বেও ইউ পি এ সরকার আধিপত্যবাদী ইস্রাইলের সাথে সামরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সর্বশেষ নেপাল সরকারকে অস্ত্র সরবরাহে প্রতিশ্রুত হয়েছে সরকার।

আজ ইউ পি এ সরকারের বর্ষপূর্তিতে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পাঁচ বছরের জন্য বাম সমর্থনের নিশ্চয়তা ইউ পি এ সরকারকে পুঁজিবাদী সর্বনাশা সংস্কারের কাজে আরও বেপরোয়া করে তুলেছে। কংগ্রেস নেতারা খুব ভালভাবেই জানেন যে, সিপিএম সহ বামপন্থী দলগুলি বাইরে আর্থিক নীতির যত বিরোধিতাই করুক না কেন, আন্তরিকভাবে তারাও একই পথেরই পথিক। দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিক এবং প্রতিনিধিরাও সিপিএমের আচরণে খুব খুশি। পশ্চিমবাংলায় সিপিএম সরকারের 'সংস্কারের কাজে' মালিকশ্রেণী এত খুশি যে দেশে ধনীর তালিকায় প্রথমে থাকা আজিম প্রেমজি তো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেশের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রীর শিরোপাই দিয়ে দিয়েছেন! প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-ও একই কথা বলেছেন। ইউ পি এ-কে সিপিএম সমর্থন করায় শুরুতে কোন কোন মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হলে, ওয়াশিংটনে মার্কিন শিল্পপতিদের এক সম্মেলনে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শিরোমণি রিলায়েন্সের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি বলেছিলেন, 'আন্তর্জাতিক লগ্নিকারী এবং বিশেষজ্ঞদের ভারতের কমিউনিস্টদের নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কী আছে? আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, ভারতে কমিউনিস্টরা উল্টে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে সমালোচকদের লজ্জিত করবে' (দি স্টেটসম্যান, ২২-০৫-০৪)। অর্থাৎ সিপিএমের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্রটি ভারতের একচেটে পুঁজিপতিরাও যে ভাল করেই জেনে ও চিনে ফেলেছে, আম্বানি সেটাই বলে দিলেন। বস্তুত, এখন কংগ্রেসকে ক্ষমতায় রেখে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী দেশের সাধারণ মানুষের উপর নানাবিধ আক্রমণের যে স্টীম রোলার চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আশঙ্কাকে, গণআন্দোলনের সম্ভাবনাকে আটকাবার কাজে সিপিএম মালিকশ্রেণীর হাতে বাফারের ভূমিকা পালন করছে। সিপিএমের স্বার্থ একটাই, তাহল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি দেশি-বিদেশি পুঁজির সমর্থন ও মদত যেন অটুট থাকে, সরকারি ক্ষমতার ভোগবিলাস যেন সিপিএম নেতাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়। ফলে, ইউ পি এ-র এক বছরের শাসনেই দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, আগামী চারটি বছর ধরেও সাধারণ মানুষের উপর এই শোষণের স্টীম রোলার চলতেই থাকবে, যদিনা বাম নামধারী সিপিএমের চালাকির মুখোশ খুলে দিয়ে এই শোষণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সঠিক নেতৃত্বে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়।

হাসপাতালে ব্যাপক চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদ

একের পাতার পর

বক্তব্যের পর সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

সম্মেলনের পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে মিছিল করে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে এক গণঅবস্থানের কর্মসূচি পালন করা হয়। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল, প্রণতি ভট্টাচার্য (পুরুলিয়া), পূর্ণিমা কর্মকার (মুর্শিদাবাদ), ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, ডাঃ অশোক সামন্ত, সদানন্দ বাগল, ডাঃ ঝোটন দাস (কলকাতা), আশিসকুমার ঘোষ (এ ডব্লু বি এস আর ইউ), নিরঞ্জন নস্কর, ডাঃ অর্ণব সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বক্তারা রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করে দাবি করেন — অবিলম্বে পরিষেবা, পথ্য প্রভৃতির বর্ধিত চার্জ প্রত্যাহার করতে হবে ; কুকুরে কামড়ানো, সাপে-কাটার ওষুধ সর্বত্র সরবরাহ, শূন্যপদে স্থায়ী নার্স, ল্যাব-টেকনিসিয়ান, ফার্মাসিস্ট ও চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে ; গ্রামীণ নন্-রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের ট্রেনিং দিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে লাগাতে হবে ; পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, মেডিক্যাল শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি প্রত্যাহার করতে হবে, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ করা চলবে না।

দাবিপত্র নিয়ে এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্য যান। কিন্তু পূর্বে জানানো সত্ত্বেও উভয়েই অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের পক্ষ থেকে শ্রমমন্ত্রী মহঃ আমিন প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করেন এবং দাবিগুলি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতির সংবাদ পেয়ে গণঅবস্থানে তীব্র ধিক্কার ওঠে। অবস্থান থেকে জনস্বাস্থ্যের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সোভিয়েট জনগণের সংগ্রাম

পাঁচের পাতার পর

ভুলতে পারিনা। নাৎসিবাহিনী যখন পোল্যাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে সোভিয়েটই একমাত্র দেশ যারা লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের জন্য তাদের দেশের সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছিল।' (আইডিয়াজ অ্যান্ড ওপিনিয়নস্; দি ওয়ার ইজ ওন, বাট দি পিস ইজ নট — আইনস্টাইন)। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'হোয়াই সোস্যালিজম' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন ঃ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সমস্ত অমঙ্গলকে নির্মূল করার একটিমাত্র উপায় আছে — তা হল একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ও তার সঙ্গে সমাজমুখী একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই অর্থনীতিতে সমাজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন হয় বলে তা কর্মক্ষম সমস্ত মানুষের কাজের সংস্থান করবে এবং শিশু থেকে শুরু করে প্রতিটি নরনারীর জীবিকা অর্জনকে সুনিশ্চিত করবে।' আরও বললেন, 'সমাজতন্ত্র একটি সামাজিক ও নৈতিক পূর্ণতার পথনির্দেশ করে।'

সোভিয়েটের মর্যাদাকে খাটো করে দেখাতে সাম্রাজ্যবাদীদের অপচেষ্টা

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও বিজয় একদিকে যখন বিশ্ববাসীর দ্বারা, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের দ্বারা, বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে, অন্যদিকে তখন থেকেই বৃটেন, আমেরিকার মত পশ্চিমী শক্তিগুলি নানাভাবে সোভিয়েটের মহত্ত্বকে খাটো করে দেখানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনও তা চালিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েট লালফৌজের প্রাক্তন জেনারেল ফিলিপ বকভ-এর ভাষায় ঃ 'নাৎসি আক্রমণ থেকে ইউরোপকে মুক্ত করতে সোভিয়েট বাহিনী যে ভূমিকা পালন করেছিল, যুদ্ধের পরবর্তীকালেও যেমন, ঠিক তেমনি যুদ্ধ চলাকালীনও তাকে খাটো করে দেখানো হচ্ছিল। ···আমাদের মিত্রপক্ষের সঙ্গীরা বিশেষত গ্রেট বৃটেন ও ব্যক্তিগতভাবে চার্চিল দেখাতে চেয়েছিলেন যে, এই জয়ের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন কেবলমাত্র তাঁরাই, এবং সুনির্দিষ্টভাবে বৃটেন।' হলিউডে এমন সব সিনেমা বানানো হয়েছে, যেগুলিতে দেখানো হয়েছে আমেরিকা ও বৃটেনই হিটলারবাহিনীকে পরাস্ত করেছে, বিশ্বকে তাদের সন্ত্রাস থেকে উদ্ধার করেছে; সোভিয়েটের ভূমিকা সেখানে অতি নগন্য। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৬০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে এবছরও এইসব ছবি দেখিয়েছে পশ্চিমী টিভি চ্যানেলগুলো। শুধু তাই নয়, এবার নানা সভায়, টিভির পর্দায়, সংবাদমাধ্যমে তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সৈনিক ও বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এমনভাবে উপস্থাপিত করেছে যার দ্বারা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব রণাঙ্গণে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে গুরুত্বহীন করে দেখানো যায়। সেই সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্যোগে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত পশ্চিমী ইতিহাস গ্রন্থে ৬০ বছর আগের সেই সংগ্রামের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হচ্ছে; তাতে দেখানো হচ্ছে যে, যুদ্ধপীড়িত ইউরোপকে উদ্ধার করতে আমেরিকার আবির্ভাব ঘটেছিল এবং ইউরোপকে নাৎসী বর্বরতার দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে আমেরিকাই। সেই সঙ্গে ফ্যাসিস্টবাহিনীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক লড়াইয়ের প্রধান সেনাপতি মহান স্ট্যালিন সম্পর্কে এবং সোভিয়েট জনগণ ও তার গৌরবময় লালফৌজ সম্পর্কে অজস্র নোংরা কুৎসা ও মিথ্যাপ্রচার চালানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং তার পরবর্তীতে জন্মানো নতুন প্রজন্মের বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে একশ্রেণীর তথাকথিত 'ঐতিহাসিক' বিপুল মার্কিন ডলারের কাছে নিজেদের বিবেক বিক্রি করে মিথ্যার ইতিহাস লিখছেন। তাঁরা হিটলার ও স্ট্যালিনকে 'যমজ শয়তান' হিসাবে দেখাচ্ছেন এবং ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমকে সমগোত্রীয় সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করছেন; এজন্য তাঁরা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন ১৯৩৯ সালের ২৪ আগস্ট জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েটের অনাক্রমণ চুক্তিকে।

(ক্রমশ)

কলকাতায় জলকর বসছে

একের পাতার পর

যদি থাকত, তাহলে ওঁদের মধ্যে কোনও একজনও বলতেন যে, শহরের মানুষকে আগে পর্যাপ্ত পানীয় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করব, পরিশ্রুত ও আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করে কলকাতার গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষ, যাদের প্রত্যহ জল ফুটিয়ে খাওয়ার সামর্থ্য নেই, তাদের জন্ডিস, আন্ত্রিক ও আর্সেনিকের আক্রমণ থেকে বাঁচাব। তিন জনের কেউই একথা বলেননি।

বিকাশবাবু নিজেকে 'বামপন্থী' প্রমাণ করার জন্য 'সকলের উপর জলকর' চাপানোর বিরুদ্ধতা করে ভাব দেখিয়েছেন তাঁর দল যেন গরিব ও স্বল্প আয়ের মানুষদের উপর জলকর চাপাতে চায় না। এও মিথ্যাচার, যার প্রমাণ ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ মাশুল ও হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধির ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। ব্যাপকহারে বিদ্যুৎমাশুল বাড়াবার সময় বিকাশবাবুর দল সিপিএম বলেছিল গরিবদের রেহাই দেওয়া হবে। ওটা ছিল ফাঁকা কথা, বাস্তবে কিছুই হয়নি। সরকারি হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির সময়ও বলা হয়েছিল, গরিবের জন্য ফ্রি-বেড ও ফ্রি-চিকিৎসা থাকবে। রাজ্যের গরিব মানুষরা জানে, এটাও এক নিদারুণ মিথ্যাচার, যেটা মূল্যবৃদ্ধি করার সময় গরিব মানুষকে ধোঁকা দিতে সরকার প্রচার করে থাকে। কলকাতা পুরসভায় প্রস্তাবিত জলকরের ক্ষেত্রেও অন্যরকম হবে না তা বলেই দেওয়া যায়। অতএব কলকাতার গরিব মধ্যবিত্ত সাবধান! জলকর থেকে তাঁরা মোটেই রেহাই পাবেন না যদিনা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

জলকর বসানোর জন্য এত ব্যগ্রতা কেন? অজুহাত একটাই পুরসভার টাকা নেই। তবে যে বলা হচ্ছে, পুরসভার কর আদায় বেড়েছে, আয় বেড়েছে, সরকারও সাহায্য দিয়েছে ! সেই টাকা যাচ্ছে কোথায়? ধনীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য চকচকে রাস্তা ও ফোয়ারা-পার্ক বানাতে? বিদেশ থেকে প্রচুর টাকা ঋণও নেওয়া হয়েছে। সুদসমেত সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যই কি গরিব মধ্যবিত্তের ঘাড়ে জলকর? ঋণদাতা সংস্থাগুলোর শর্তও কি সেটাই?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ডি এফ আই ডি'র কাছ থেকে যে শর্তের বিনিময়ে উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে নাগরিকদের ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে, তার মধ্যে জলকর চালু করা অন্যতম। এই ঋণের কানাকড়ি পর্যন্ত নাগরিকদের শোধ করতে হবে — সেজন্য জলকর গুণতে হবে। জল যদি পয়সা দিয়েই কিনতে হয়, তাহলে পরিষেবা থাকলো কোথায়?

नागपুর ঃ ৮ মে প্রবাসী নেপালী সংঘ, মূল প্রবাহ অখিল ভারত নেপালী একতা সমাজ ও এস ইউ সি আই-এর যৌথ বিক্ষোভ। বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই নাগপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মাধব ভোন্ডে

ডোমকলে মহকুমা শাসকের অফিসে ভাঙন দুর্গতদের বিক্ষোভ ও অবস্থান

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও জলসম্পদ মন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে ভাঙন প্রতিরোধে ৬৮ কোটি টাকার প্রকল্প আজ পর্যন্ত কার্যকরী করার কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আবার বর্ষার মরশুম আসছে, ভাঙন উদ্বাস্তুদের বুক কাঁপছে। আবার জমি জায়গা, ঘরবাড়ি পদ্মাগর্ভে তলিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গত ২৪ মে ভাঙন কবলিত এলাকার অনাহারক্লিষ্ট নারী-বৃদ্ধ-শিশুরা শ'য়ে শ'য়ে বিক্ষোভ দেখাল মহকুমা শাসকের দপ্তরে। মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির ডোমকল মহকুমা শাখার উদ্যোগে প্রবল গরমের মধ্যেও সারা দিন ধরে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি চলে। তিন দিন পূর্বে মৃত শ্যামাপদ হালদারের স্ত্রী গঙ্গাবালা চোখের জলে তাঁর অসহায়তার কথা শোনালেন। এমনই এসেছিলেন দয়ারামপুরের মৃত আলিমুদ্দিন বিশ্বাস ও জাহেদা বিবির দুঃস্থ কন্যা গোলেনুর বেগম, পরাশপুরের অনাহারে মৃত গহর মণ্ডলের তরুণী স্ত্রী আজেদা বেওয়া। দু'টি দুধের শিশু বুকে করে মমতাজ বেওয়াও বর্তমানে ভাঙন উদ্বাস্তু। মাধ্যমিক পাশ করেও অর্থের অভাবে পড়াশুনা চালাতে পারছে না ঘোষপাড়ার মর্জিনা খাতুন। অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে কিশোরী রুম্পা শর্মা। শোকার্ত মা এদিনের অবস্থানে সে কথা শোনালেন। জমিরুন বিবি সরকারের প্রতি ক্ষোভ উগরে বলেন, রক্ত ঝরলেও আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। ভাঙন উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ, কাজ ও খাদ্য, পুনর্বাসন এবং নদীর পাড় বাঁধাইয়ের মত নয় দফা দাবি নিয়ে দশজনের প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কমিটির জেলা সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী ও অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানু সহ জলঙ্গী ব্লক সভাপতি শিক্ষক এহিয়া মণ্ডল, আরমান মণ্ডল, আবুল কালাম শা, সজন মণ্ডল, কমিটির ইসলামপুর শাখা সম্পাদক সায়গল সরকার, রানীনগর শাখা সম্পাদক ইস্রাফিল হোসেন এবং প্রাক্তন প্রধান দয়ারামপুরের ইসমাইল মণ্ডল প্রমুখ প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন।

আলোচনার পর এস ডি ও জানান, জেগে ওঠা পদ্মার চরে পুনর্বাসনের জন্য কলোনি তৈরির উদ্দেশ্যে ৫৪০ জনের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে; বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা, অন্ত্যোদয় যোজনা এবং অন্নপূর্ণা যোজনার সাহায্য সহ মাটিকাটার কাজ দেওয়া হবে। কমিটির নেতৃত্ব মহকুমা শাসককে বলেন যে, অভাবের তাড়নায় দেহব্যবসা, নারীপাচার যেমন চলছে তেমনই ভিন্ রাজ্যে কাজের লোভ দেখিয়ে একদল দুষ্কৃতী কিশোর ও যুবকদের পাচার করে দিচ্ছে। মহকুমা শাসক দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন।

এদিনের অবস্থানে বক্তব্য রাখেন, জেলা যুগ্ম-সম্পাদক সাধন রায়, জেলা নেতা সাজেম আলি, খাদিজা বানু, আব্দুল আজিম, আছিয়া বেগম, নাজিমুদ্দিন মণ্ডল প্রমুখ।

সিপিএম-সিপিআই নেতাদের পাকিস্তান সফর

সাতের পাতার পর

করেনি। সি পি আই-এর ভাঙনের মধ্যেও কোন মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল না, নেতাদের কোন্দলই ছিল কারণ। এজন্যই বহু নেতা-কর্মীর আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, এই দুটি পার্টিই এদেশে সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়ে পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষা করায় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বৈশিষ্ট্য নিয়েই দাঁড়িয়েছে, যা আজ এদের ভূমিকার মধ্য দিয়ে এক বিরাট অংশের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছে অনেকটাই উদ্‌ঘাটিত। এদের কাছে 'বিপ্লব' মানে নানা বুর্জোয়া দলের সাথে আঁতাত করে পার্লামেন্টে সরকারি ক্ষমতার অংশীদার হওয়া। আজ তো পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের সমর্থক রূপে এবং রাজ্যে শাসক দল হিসাবে এরা নগ্নভাবেই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সেবা করে চলেছে। এদিক থেকে দেখলে, এই দুই দলই এখন ভারতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে।

এই যাদের চরিত্র, তাদের পক্ষে পাকিস্তানে গিয়ে সেদেশের বামপন্থী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করা, ভারত রাষ্ট্রের পরিবর্তে ভারতের নিপীড়িত জনগণের কথা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিবর্তে সেদেশের নিপীড়িত জনগণের কথা ভাবা ও বলা আদৌ সম্ভব নয়। এজন্য পাকিস্তানের বামপন্থীদের জানতে হবে এস ইউ সি আই-এর মতো দলকে, যারা ভারতের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের স্বার্থ নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সরকারি পুলিশের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে ধারাবাহিক গণআন্দোলন গড়ে তুলছে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in